পাবলো নেরুদার শ্রেষ্ঠ কবিতা

অনুবাদক : অসিত সরকার

পরিবেশক

নাথ ব্রাদার্স : ৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট : কলকাতা ৭৩

প্রথম প্রকাশ
আষাঢ় ১৩৬৪

প্রকাশক
সমীরকুমার নাথ
নাথ পাবলিসিং হাউস
২৬বি পণ্ডিতিয়া রোড
কলকাতা ২৯
প্রচ্ছদপট
গৌতম রায়
মুদ্রক
জগন্নাথ পান
শান্তিনাথ প্রেস
১৬ হেমেন্দ্র সেন স্ট্রীট
কলকাতা ৬

বারো টাকা

ভূমিকা

পাবলো নেরুদা এমনই একজন কবি, যাঁকে বিশেষ কোনো সংজ্ঞায় ভূষিত করা যায় না। তাঁর কাব্যসাধনার প্রতিটি পর্বেই এসেছে নতুন নতুন বৈচিত্র্য। সেই বৈচিত্র্য বিষয়বস্তুতে, আঙ্গিকে, অভিব্যক্তিতে, ব্যঞ্জনায়। গোটা লাতিন আমেরিকা-কেই তিনি জীবন্ত করে তুলেছেন তাঁর কবিতায়। তাঁর পাহাড়-পর্বত, নদ-নদী, গভীর অরণ্য, বিক্ষুব্ধ বাতাস, এমন কি মাকচু পিকচুর মৃত নগরীও মানুষের মতো প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে—প্রতিরোধে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে।

নেরুদার বৈশিষ্ট্য শুধু তাঁর আঙ্গিকসর্বস্বতা বা বিষয়বস্তুর গভীর ব্যাপ্তিতে নয়, বৈশিষ্ট্য অন্তর্নিহিত ও বহির্সত্তায়। বৈশিষ্ট্য উভয়ের আশ্চর্য সমন্বয়ে। বৈশিষ্ট্য তাঁর প্রতীকধর্মিতায়।

সমগ্র লাতিন আমেরিকার সংগ্রামী মানসকে তিনি তুলে ধরেছেন তাঁর কবিতায়। এই সংগ্রামী মানস তাঁর লেখনীর স্পর্শে কখনও বজ্রের মতো গুরু গুরু বেজে উঠেছে, কখনও বা দুর্বোধ্যতায় অবনমিত হয়ে অজস্র মানুষের মধ্যে, গহন অরণ্যে কিংবা উত্তুঙ্গ পর্বতকন্দরে আত্মগোপন করেছে। মার্কসবাদী অনিবন্টে বিশ্বাসী হওয়ার পরও তিনি তাঁর কাব্যে দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ ও প্রতিকীবাদের সংমিশ্রণ ঘটিয়েছেন। ফলে দুর্বোধ্যতা এবং স্বচ্ছতা তাঁর কবিতার আত্মাকে কখনোই দুবিষহ ও ভারাক্রান্ত করে তোলেনি, বরং তাকে করে তুলেছে প্রাণবন্ত আর গভীর।

এই বৈশিষ্ট্য নিয়েই নেরুদা তাঁর কবিতার আত্মাকে কখনও ভেঙেচুরে তৈরি করেছেন লাঙলের তীক্ষ্ন ফলা, কখনও বর্ম, কখনও বা গাঁইতি।

তাঁর কবিতায় শুধু উপস্থিত হয়নি লাতিন আমেরিকার অনন্য যোদ্ধা ইরসিলা, মিগুয়েল, বলিভার কিংবা কাস্ত্রো, উপস্থিত হয়েছেন স্তালিন, মলোতভ, ভরো-সিলভ, মাও সে-তুঙ। উপস্থিত হয়েছে কুঠার হাতে দুনিয়াকে ভেঙে-চুরে তৈরি করতে এ্যাবে, উপস্থিত হয়েছে লাতিন-পুরাণের বীর নায়ক, উপস্থিত হয়েছে স্তালিনগ্রাদের অমর যোদ্ধারা। উরালের কৃষক আর পাটাগোনিয়ার রেলশ্রমিক কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়িয়েছে নতুন বিশ্বকে গড়ে তোলার জন্যে। সারা দুনিয়ার

নির্যাতিত ও শোষিত মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে মূর্ত হয়ে উঠেছে লাতিন আমেরিকার মানুষের স্বপ্ন। সে স্বপ্ন স্বাধীনতার।

সুইডিশ নোবেল একাডেমি তাঁর কবিতা সম্পর্কে যথার্থই বলেছেন, একটি মহাদেশের স্বপ্ন এ আকাঙ্ক্ষাকে নেরুদা তাঁর কবিতায় জীবন্ত করে তুলেছেন। এই মহাদেশ হচ্ছে লাঞ্ছিত নিপীড়িত দক্ষিণ আমেরিকা।

এই মহাদেশেরই প্রশান্ত মহাসাগরের তটভূমি জুড়ে বিস্তীর্ণ যে দেশ, সেই স্বাধীন সার্বভৌম চিলির সীমান্ত শহর পাররলের এক শ্রমিকপরিবারে পাবলো নেরুদার জন্ম ১৯০৪ সালে। পাবলো নেরুদার আসল নাম নেফাতালি রিকার্দো রেইস বাসুয়াতালি। ১৯২০ সালে পড়াশোনার জন্যে চলে আসেন সান্টিয়াগোয়। চিলির বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা শেষ করে ১৯২৬ সালে তিনি বৈদেশিক দপ্তরে চাকরি নিয়ে যান রেঙ্গুনে এবং দীর্ঘ ছয়-সাত বছর প্রাচ্যের দেশগুলিতে নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করেন। ১৯৩৩ সালে তিনি মাদ্রিদে ফিরে আসেন চিলির রাষ্ট্রদূত হয়ে।

ইতিমধ্যে নেরুদা কবি হিসেবে যথেষ্ট জনপ্রিয়তা লাভ করেছেন। ১৯৩৬ সালে স্পেনে যখন গৃহযুদ্ধের আগুন সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে, তখন সেই আগুন নেরুদাকেও আলোড়িত করে তোলে। তিনি নতুন মানুষে পরিণত হন। এই সময়েই তিনি আন্তর্জাতিক বাহিনীতে আসা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কবি ও সাহিত্যিকদের সংস্পর্শে আসেন। স্পেনের বিপ্লবী লেখক, কবি এবং শিল্পীরা তাঁকে নতুন চেতনায় উদ্বুদ্ধ করে তোলেন। স্পেনের গৃহযুদ্ধের এই অগ্নিময় দিনগুলো নেরুদা অসীম ভালোবাসা আর মমতায় উদ্ভাসিত করে তুললেন তাঁর 'প্রাণের স্পেন' কাব্যগ্রন্থে। প্রকৃতপক্ষে এই সময় থেকেই তিনি মার্কসবাদে বিশ্বাসী হয়ে ওঠেন। স্পেনের গৃহযুদ্ধ নেরুদার জীবনে এনে দিলো এক যুগান্তকারী পরিবর্তন। একদিন যে কবি হতাশা ব্যর্থতা আর বেদনায় নুয়ে পড়েছিলেন, খুঁজছিলেন ব্যক্তি-মানসের স্বস্তি এবং মুক্তি, হয়ে উঠেছিলেন আত্মমুখীন—তিনিই আবার নিজেকে পরিব্যাপ্ত করে দিলেন সারাটা বিশ্বে, নেমে এলেন কল্পলোক থেকে নির্যাতিত শোষিত মানুষের রক্ত আর ঘামের মধ্যে। এই সময়ে, দীর্ঘ বার বছরের অক্লান্ত সাধনার ফলশ্রুতি তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ কাব্যকৃতি 'ক্যান্টো জেনারাল' বা 'বিশ্বসংগীত'। প্রকৃত-পক্ষে 'মাকচু পিকচুর নগর শীর্ষ' কবিতা বিশ্বসংগীত কাব্যগ্রন্থেরই অন্তর্গত।

১৯৪০ থেকে ১৯৪৩ সাল পর্যন্ত মেক্সিকোতে চিলির রাষ্ট্রদূত হিসেবে কাজ করেন, ১৯৪৫ সালে সেনেটে নির্বাচিত হন এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর তিনি কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন।

বিশ্ব শান্তি এবং সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের তিনি একজন নির্ভিক যোদ্ধা। তাই ১৯৫০ সালে তাঁকে আন্তর্জাতিক শান্তি পুরস্কার এবং ১৯৫১ সালে লেনিন পুরস্কারে সম্মানিত করা হয়। সাহিত্যের সর্বোচ্চ সম্মান নোবেল পুরস্কার। প্যারিতে চিলির রাষ্ট্রদূত হিসেবে কাজ করেন, চিলিতে সামরিক অভ্যুত্থানের সময় এই বিশ্ববিশ্রুত কবির মৃত্যু হয়।

সূচীপত্র

পাবলো নেরুদার শ্রেষ্ঠ কবিতা

নারীর শরীর

নারীর রমণীয় শরীর, সাদা পাহাড়, শুভ্র উরু,
আত্মদানের ভঙ্গিতে তুমি শুয়ে আছো, এ উর্বরা পৃথিবী।
আমার এ চাষাড়ে দেহ তোমাকে গভীর ভাবে কর্ষণ করছে
যাতে মাটির গহন থেকে লাফিয়ে উঠতে পারে শিশু।

আমি ছিলাম সুড়ঙ্গের মতো একা। পাখিরা ভয়ে পালাতো,
আর রাত্রি দুর্দম আবেগে আমাকে সম্পূর্ণ মজিয়ে দিতো।
নিজেকে বাঁচাতে আমি তোমাকে করে তুলেছি তীক্ষ্ণ আয়ুধ,
তুমি যেন আমার বাঁকানো ধনুকে তীর, ফিঙের মর্মঘাতী পাথর।

প্রতিশোধের মুহূর্ত যখন ঘনিয়ে এলো, তোমাকে ভালোবেসে ফেললাম।
শেওলার মতো নরম ত্বক, দুধের মতো ভরাট, উন্মুখ শরীর।
স্তনভারের নিটোল মসৃণতা, আহা, তন্ময় আয়ত দুটো চোখ!
কটিতটের পুঞ্জিত গোলাপ, হায়, মন্দ্র ম্লান তোমার কণ্ঠস্বর!

আমার নারীর শুভ্র শরীর, আমি আঁকড়ে থাকবো তোমার লাবণ্য।
আমার তৃষ্ণা, আমার অসীম কামনা, আমার যাকিছু দ্বিধা!
অন্ধকার নদীগর্ভে চিরদিনই বহমান শাশ্বত অনন্ত তৃষ্ণা,
তারই পেছনে ত্রস্ত ধেয়ে আসে যত ক্লান্তি আর অন্তহীন ব্যথা।

আহা, পাইনের বিস্তীর্ণতা

আহা, পাইনের বিস্তীর্ণতা, তোমারই মধ্যে ভাঙে মর্মরিত ঢেউ,
আলো-ছায়ার নিঃশব্দ খেলা আর নির্জন ঘণ্টাধ্বনি।
তোমার দু চোখে নামে গোধূলির আলো, খেলার পুতুল,
সমুদ্র-শঙ্খ, যার সত্তার গহন গভীরে এ পৃথিবী গান গায়!

তোমার গহন গভীরে নদীরা গান গায়, তোমারই ললিত ইচ্ছায়
আমার হৃদয় ডানা মেলে, তুমি তাকে যেখানে খুশি পাঠাও।
আমার লক্ষ্য-পথের নিশানা তোমার আশার ওই দু ভ্রূর মাঝে
থর থর আবেগে কখন মুক্তি দেবো আমার তীরের একঝাঁক পাখি।

যেখানে তাকাই, সবখানেই দেখি তোমার অতনু কুয়াশার কটিদেশ,
আর তোমার নীরবতা আহত করে আমার ব্যাকুল মুহূর্তগুলি।
আমার চুম্বনেরা নোঙর ফেলে আর সিক্ত বাসনাগুলো
নীড় বাঁধে তোমার স্বচ্ছ পাথরের আলিঙ্গনে, তোমার বুকের গভীরে

আঃ, নিবিড় ভালোবাসায় বেজে ওঠা তোমার কণ্ঠস্বর
যেন ঘনায়মান সন্ধ্যার নিথর নির্জনতায় ঘণ্টার মৃদু প্রতিধ্বনি!
এমনি ভাবে গভীর সব মুহূর্তে আমি দেখেছি প্রান্তরের বুকে
বাতাসের গায়ে গায়ে মর্মরিত ফসলের মৃদু কানাকানি।

তুমি ঠিক যেমনটা ছিলে

গত শরতে তুমি ঠিক যেমনটা ছিলে আমি সেই রকমই ভাবি।
তুমি ছিলে ধূসর অবগুণ্ঠনের মতো, নিশ্চল শান্ত হৃদয়।
তোমার দুচোখে ছিলো গোধূলির আরক্ত শিখা।
আর তোমার হৃদয়-তরঙ্গে ক্রমাগত ঝরে পড়তো শুকনো পাতা।

লতিয়ে-ওঠা শাখার মতো তুমি আমার হাতদুটো জড়িয়ে ছিলে।
পাতার মর্মরে তোমার কণ্ঠস্বর ছিলো শান্ত স্থির।
আতসবাজির বহ্ন্যুৎসবে জ্বলছিলো আমার আকণ্ঠ তৃষ্ণা।
আর তুমি আমার বুকের ওপর মিষ্টি নীলাভ কচুরিপানার ফুলের মতো
চুপটি করে পড়েছিলে।

অনুভবে বুঝেছিলাম তোমার চোখদুটো ভেসে বেড়াচ্ছে আর শরৎ তখনও
অনেক দূরে,
ধূসর অবগুণ্ঠন, পাখির কলতান, আর তোমার হৃদয় যেন একটা নীড়
যার দিকে আমার গভীর কামনা কেবলই উড়ে যেতে চায়
আর তপ্ত অঙ্গারের মতো ঝরে পড়ে আমার সুখী চুম্বন।

জাহাজ থেকে দেখা আকাশ, পাহাড় থেকে দেখা প্রান্তর :
আলো আর ধোঁয়ায় ছাওয়া তোমার স্মৃতি যেন শান্ত হ্রদের মতো!
তোমার দৃষ্টির সীমানা ছাড়িয়ে দূরে, বহু দূরে, রাঙা হয়েছিলো সন্ধ্যা
আর শরতের শুকনো পাতাগুলো ঘুরছিলো তোমার বুকের চারপাশে।

শ্বেত মধুকর

মধুর লোভে মাতাল তুমি শ্বেত মধুকর,
আমার বুকের মধ্যে গুনগুনিয়ে ওঠো,
বাতাসে পেঁচিয়ে-ওঠা ধোঁয়ার রেখার মতোই
তুমি আবার পালিয়ে যাও।

আমি এমনই একটা মানুষ, আশা বলতে যার কিছু নেই,
প্রতিধ্বনিহীন একটা শব্দ,
যে সবকিছুই হারিয়ে বসে আছে
অথচ একদিন যার সব ছিলো।

তুমিই শেষ নোঙর, যার মধ্যে আমার অন্তিম বাসনা
ভেঙে চুরমার হয়ে যায়।
আমার বন্ধ্যাভূমিতে তুমিই শেষ ফুটন্ত গোলাপ।

হায়, তবু তুমি এখনও নিশ্চুপ!

বন্ধ করো তোমার ভারি চোখের পাতা।
রাত যে ব্যস্ত হয়ে ওঠে।
আঃ, তোমার শরীর, যেন ভয় পাওয়া নগ্ন প্রতিমূর্তি।

তোমার গভীর দু চোখে রাত্রি নামে।
ফুলের মতো ঠাণ্ডা বাহু, গোলাপের মতো স্নিগ্ধ কোল
তোমার স্তন শঙ্খের মতো শুভ্র, নিটোল।

তোমার জঙ্ঘায় ঘুমুবে বলে উড়ে আসে
ছায়ার ছোট্ট একটা প্রজাপতি।

হায়, তবু তুমি এখনও নিশ্চুপ!

জায়গাটা অসম্ভব নির্জন,
আর এই নির্জনতায় তুমি নেই।
বৃষ্টি পড়ছে।
সামুদ্রিক বাতাস তাড়িয়ে নিয়ে ফিরছে বিশৃঙ্খল গাংচিলদের

ভিজে রাস্তায় খালি পায়ে হেঁটে চলেছে জলস্রোত।
গাছের শাখায় সিক্ত পাতাদের অভিযোগ,
যেন ওরা কত অসুস্থ।

শ্বেত মধুকর, চলে যাবার পরেও
তুমি আমার বুকের মধ্যে গুনগুনিয়ে বাজো,
শীর্ণ মৌন সময়ের মধ্যে তুমি আবার বেঁচে ওঠো।

হায়, তবু তুমি এখনও নিশ্চুপ

প্রায় আকাশ ছাড়িয়ে

প্রায় আকাশ ছাড়িয়ে আধখানা চাঁদ
দুই পাহাড়ের মাঝে নোঙর ফেলে দাঁড়িয়ে রয়েছে।
চোখ খুঁড়তে খুঁড়তে চলা রাত ঘুরছে ফিরছে।
চলো, দেখে আসি কতগুলো তারা ভেঙেচুরে পড়ে আছে ওই হ্রদের জলে ঃ

আমার দুই চোখের মাঝে শোকের ক্রুশচিহ্ন এঁকেই আবার তা উধাও।
নীল খনিজের দ্যুতি, সংগ্রামের শান্ত রাতগুলো—
হৃদয় হৃদয়, আমার খ্যাপা চাকার মতো কেবলই ঘুরে চলেছে।
সুদূর থেকে এসেছে যে মেয়ে, দূর দেশ থেকে যাকে আনা হয়েছে,
আকাশের নিচে কখনও কখনও তার চোখ দীপ্তশিখায় আশ্চর্য জ্বলে ওঠে।,
বিক্ষুব্ধ ঝড়, ঝঞ্ঝা, প্রচণ্ড ক্রোধের খ্যাপা হাওয়া,
বিরামবিহীন তুমি আমার বুকের ওপর দিয়ে ছুটে যাও।
কবরগুলো থেকে বাতাস বয়ে আনে তোমার এলোমেলো নিদ্রালস শেকড়।

তোমার অন্যপারের বড় বড় গাছগুলো মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়ে রয়েছে।
অথচ তুমি নির্মেঘ, শস্যকণার মতো তোমার ছড়ানো কুন্তল।
উজ্জ্বল পাতাগুলোকে নিয়ে বাতাস যা বানায়, তুমি তাই-ই।
তুমি রাতের মায়াবী পাহাড়ের ওপারে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের শ্বেতপদ্ম,
আঃ, আমি বলতে পারছি না, কিছুই বলতে পারছি না—
তুমি সব, তুমি সবকিছু দিয়ে গড়া!

বাসনা আমার ভেঙে টুকরো টুকরো করেছে বুক,
এখন অন্য আর একটা পথ ধরাই ভালো, যে পথে ও কখনও হাসবে না।
যে ঝড় কবর দিয়েছে ঘণ্টাধ্বনি, যন্ত্রণার পঙ্কিল আবর্ত
সে ঝড় কেন ওকে স্পর্শ করলো, কেন ওকে করে তুললো এমন বিষাদ-প্রতিমা!
যে পথ সবকিছু থেকে অনেক দূরে সরে গেছে সেই পথ ধরাই ভালো,
যেখানে কোনো ক্রোধ নেই, অভিমান নেই, মৃত্যু নেই,
যেখানে কেবল শীত শিশিরে তার অপলক চোখ মেলে অপেক্ষা করছে।

তোমার স্তনভার

আমার হৃদয়ের জন্যে তোমার স্তনভারই যথেষ্ট
আর তোমার স্বাধীনতার জন্যে আমার দুটি ডানা।
তোমার বুকের গভীরে যা ঘুমিয়ে ছিলো
আমার মুখের মধ্যে থেকে তা পাখা মেলবে আকাশে।

তোমারই মধ্যে প্রতিদিনের মায়া।
ফুলের পাপড়িতে শিশিরের মতো তুমি আসো।
তুমি না থাকলে দিগন্ত ম্লান হয়ে ওঠে।
ঢেউয়েরা চিরদিনের জন্যে উধাও হয়ে যায়।

আমি বলেছি তুমি বাতাসে মাস্তুলের মতো
দেবদারুর আন্দোলিত শাখার মতো গান গাও।
ওদেরই মতো তুমি দীর্ঘ আর ঋজু,
বিষণ্ণ, আবার একই সময়ে যাত্রার মতো উচ্ছল।

পুরনো রাস্তার মতো যা পাও তুমি সবই সংগ্রহ করো।
তুমি স্বচ্ছ প্রতিধ্বনি আর ঘর-কাতুরে মানুষের অজস্র কণ্ঠস্বরে ভরা।
আমি জেগে উঠলেই পাখিরা ভয়ে পালায়
অথচ তোমার বুকের মধ্যে ওরা এতক্ষণ শান্ত হয়েই ঘুমিয়ে ছিলো।

নরম আর রোদেপোড়া তামাটে মেয়ে

নরম আর রোদেপোড়া তামাটে মেয়ে, সূর্য যেমন
গড়ে তোলে ফল, পাকিয়ে তোলে বীজ, কুঁকড়ে দেয় সমুদ্র ঝাঁঝিরদের
তেমনি তোমার দেহটাকেও ভরিয়ে তোলে আনন্দে, তোমার উজ্জ্বল
টানাটানা চোখ, তোমার মুখের সহজ হাসিটাও ওই জলের রেখার মতন।

তুমি যখন টান টান মেলে দাও দু বাহু, তোমার কালো কেশরের
ঘন আস্তাবলে বাধা পড়ে কুচকুচে কালো দুরন্ত একটা সূর্য।
ছোট্ট তটিনীরই মতো তুমি সূর্যের সঙ্গে খেলা করো,
আর সে তোমার দু চোখে রেখে যায় দুটো গাঢ় নির্ঝরিণী।

নরম আর রোদেপোড়া তামাটে মেয়ে, কোনকিছুই আমাকে টানে না আর তোমার
দিকে।
সবকিছুই আমাকে দূরে ঠেলে নিয়ে যায়, যেন তুমি ভরন্ত দুপুর।
তুমি মৌমাছির উন্মত্ত চঞ্চল যৌবন, ঢেউয়েদের ত্রস্ত আনাগোনা,
তুমি ফসলের মর্মরিত কানাকানি।

আমার শোকমগ্ন শান্ত হৃদয় তোমাকে খোঁজে, অথচ পাই না।
আমি ভালোবাসি তোমার উচ্ছল শরীর, তোমার বহমান মৃদু স্বচ্ছ কণ্ঠস্বর।
আশ্চর্য মগ্ন কৃষ্ণ প্রজাপতি তুমি
তুমি যেন বিস্তীর্ণ ফসলের মাঠ আর সূর্য,
তুমি যেন স্বচ্ছ জলের রেখা আর মিষ্টি পপি।

আজ রাতে আমি লিখতে পারি

আজ রাতে আমি লিখতে পারি সবচেয়ে করুণ পংক্তিগুলো।

লিখতে পারি, যেমন : 'তারকাখচিত রাত্রি,
'সুদূর দিগন্তে কাঁপছে রাশি রাশি নীলিম নক্ষত্র।'
রাতের শৃঙ্খল বাতাস আকাশে ঘুরে ঘুরে গান গায়।

আজ রাতে আমি লিখতে পারি সবচেয়ে বিষণ্ণ পংক্তিগুলো।
একদিন ওকে আমি নিবিড় করে ভালোবাসতাম,
আর ও-ও আমাকে।

এমনই কোনো নক্ষত্রখচিত রাতে
আমি ওকে দু হাতে জড়িয়ে ধরতাম।
সীমাহীন আকাশের নিচে
চুমায় চুমায় ভরিয়ে দিতাম ওর সারা মুখ।

একদিন ও আমাকে নিবিড় করে ভালোবাসতো,
আর আমিও ওকে।
ওর স্থির, গভীর আয়ত চোখদুটোকে
ভালো না বেসে থাকা অসম্ভব।

আজ রাতে আমি লিখতে পারি সবচেয়ে করুণ পংক্তিগুলো।
শুধু এই ভেবে আমি ওকে পাইনি।
ওকে আমি হারিয়েছি নির্মমভাবে।

ওকে ছাড়া সুদীর্ঘ এই রাত যেন আরো বিশাল।
কবিতা আমার হৃদয়ে ঘাসের বুকে শিশিরের মতো টুপটাপ ঝরে পড়ে
কি এসে যায় যদি প্রেম আমার ওকে ধরে রাখতে না পারে।
নক্ষত্রখচিত রাত, আর ও নেই আমার পাশে—এইটেই বড় কথা।

দূরে, বহুদূরে কে যেন গান গায়।
ওর বিচ্ছেদে হৃদয় আমার পূর্ণ হয়নি এতটুকু।

অপলক দৃষ্টি খোঁজে ওর সারাটা শরীর
যেন কাছে টেনে নিতে চাই।
আমার সমস্ত সত্তা ওকে খোঁজে, অথচ ও নেই আমার পাশে।

সেই একই রাত একই গাছেদের উদ্ভাসিত করে তোলে।
অথচ সেদিনকার সেই আমরা আর এক নই।

আমি ওকে ভালোবাসি না আর, একথা সত্যি,
অথচ একদিন কি নিবিড়ই না ভালোবেসেছিলাম।
ওর শ্রুতি স্পর্শ করবে বলে আমার কণ্ঠস্বর বৃথাই খুঁজেছে বাতাস।

আজ ও অন্যের। অন্য কেউ। যেমন ছিলো আমাকে চুম্বনের আগে
ওর কণ্ঠস্বর, ওর উজ্জ্বল শরীর, ওর স্বচ্ছ আয়ত চোখ।

এখন ওকে ভালোবাসি না আর, একথা সত্যি,
অথচ কি নিবিড়ই না ভালোবাসতে পারতাম।
ভালোবাসা কত ক্ষণিক, আর কি বিপুল সেই বিস্মরণের স্মৃতি।

যেহেতু এমনই কোনো নক্ষত্রখচিত রাতে
আমি ওকে দু হাতে জড়িয়ে ধরে ছিলাম
আমার হৃদয় একটুকুও পূর্ণ হয়নি ওর বিচ্ছেদে।

হয়তো ওর জন্যে পাওয়া বেদনাহত এই আমার শেষ দুঃখ,
হয়তো ওর জন্যে লেখা এই আমার শেষ কবিতা।

স্বপ্নতুরঙ্গম

অহেতুক, আয়নায় নিজেকে দেখা,
সপ্তাহ, কাগজ আর জীবনীকারের অসীম মমতা নিয়ে
আমি আমার হৃৎপিণ্ড থেকে নরকের সেনানায়কটাকে টান মেরে ছুঁড়ে ফেলে দিই.
অনিশ্চিতভাবে বিষণ্ন পংক্তিগুলোকে পর পর সাজিয়ে যাই।

এখানে ওখানে লক্ষ্যহীন ঘুরে বেড়াই. মোহগুলোকে আত্মসাৎ করি.
বাসায় গিয়ে ফিঙেদের সঙ্গে কথা বলি :
ওরা প্রায়ই ভয়ংকর নিরুত্তাপ গলায় গান গায়
আর অভিশাপগুলোকে চারপাশে ছড়িয়ে দেয়।

নিষুত রাতের গাছপালা নিয়ে
আকাশে ছড়িয়ে রয়েছে এক মহাদেশ :
সদ্য কবর-খোঁড়া উ চুনিচু মাটিতে পা ফেলে ফেলে
আমি সেখানে যাই. ক্লান্তি যে একটু আধটু থাকে না তা নয়,
সেখানে গিয়ে আমি জটিলতম সব উদ্ভিদের স্বপ্ন দেখি।

প্রকৃত অথচ হতাশ মানুষের মতো সাজগোজ করে
মূল্যবান যত দলিল আর উৎপত্তির মধ্যে দিয়ে হেঁটে যাই
ভালোবাসি ভক্তিশ্রদ্ধার নিঃশেষিত মধু,
আর সেই নম্র হিতোপদেশ যার পাতার ফাঁকে ফাঁকে
ঘুমিয়ে থাকে বুড়ো-হয়ে-যাওয়া রঙ-চটা বেগুনে ফুল :
আমি দু পায়ে দলে যাই শিস-দেওয়া গোলাপ আর মগ্ন ব্যাকুলতা.
ছিন্নভিন্ন করি যাকিছু সোহাগি চরম.
এমন কি অন্তহীন যে সময়, তার জন্যেও আমি অপেক্ষা করি :
আমার মধ্যে আমি আছি এই যে ভাবনা প্রায়ই আমাকে ম্রিয়মাণ কোরে তোলে।

কি যে দুর্লভ একটা দিন এসে হাজির হয়েছে ! ঘন দুধের মতো আলো.
একেবারে ঠাসবোনা, নিটোল, আহ্লাদে সে আমাকে ভুলিয়ে দিলো !

আমি শুনেছি তার রাঙা ঘোড়ার হ্রেষাধ্বনি,
সম্পূর্ণ নগ্ন, নালবিহীন আর আশ্চর্য উজ্জ্বল।
তার পিঠে চড়ে আমি গির্জার মাথার ওপর দিয়ে উড়ে যাই,
টগবগিয়ে পার হয়ে যাই সৈন্যদের পরিত্যক্ত ছাউনি,
আর এক জঘন্য পল্টন আমার পিছু ধাওয়া করে।
তার ইউক্যালিপটাসের চোখ লুটে নেয় ছায়া,
চাবুকের সন্ সন্ শব্দে তার প্রতিধ্বনিত দেহ টগবগিয়ে ছুটে যায়।

আমি চাই তন্ময় উজ্জ্বলতার দীপ্ত ঝলক,
উত্তরাধিকারি হিসেবে আমার দায়ভাগ নেবার জন্যে ইষ্টকুটুম্বের উৎসব

অনন্যা এ রূপসী পৃথিবী

আজ আমি শুচিশুদ্ধ রূপসী মেয়েটার পাশে শুয়ে আছি
শুয়ে আছি যেন শ্বেত পারাবারের শান্ত বেলাভূমিতে,
যেন মন্থর দিগন্তে জ্বলন্ত একটা নক্ষত্রের মর্মবিন্দুতে।

ওর দীর্ঘায়ত সবুজ চাউনি থেকে
শুকনো জলের মতো ঝরে পড়ছে আলো,
তাজা উদ্দীপনার স্বচ্ছ গভীর বৃত্তে।

ওর বুক যেন প্রজ্বলিত দুটো শিখা
দাউ দাউ জ্বলে ওঠে সমুন্নত দুই ভূমি,
দ্বিগুণ স্রোতে নদী নামে ওর দীঘল স্বচ্ছ পায়ের পাতায়।

সোনার আবহাওয়া ক্রমেই পাক ধরছে,
ওর সারা অঙ্গের আহ্নিক দ্রাঘিমা
কেবলই ভরে উঠছে সুদূরপ্রসারী ফল আর জাদুর আগুনে

ভঙ্গুর নিশান্তিকা

হতভাগ্যের দিন, বিবর্ণ পাংশুল দিন ক্রমশ ফুটে ওঠে
মর্মান্তিক হিমেল সোঁদা গন্ধে, আশ্চর্য ধূসর,
কোথাও কোনো ঘণ্টাধ্বনি নেই, টুপটাপ ঝরে পড়ে উষা :
কান্নার আবহাওয়া ঘেরা এ যেন শূন্যে ভরাডুবি।
কত না জায়গা থেকে সরে গেছে সিক্ত সজল ছায়া,
কত না অর্থহীন প্রতিরোধ, কত না পার্থিব ছাউনি থেকে,
যেখানে সে-ছায়া জুড়ে থাকতে পারতো শিকড়ের কারুকার্য,
আত্মরক্ষা জানে এমন কত না তীক্ষ্ণ অবয়ব ছেড়ে সরে গেছে ছায়া।
যাকিছু আক্রান্ত, যাকিছু বিভ্রান্ত, তার মর্মে বসে কাঁদি
বেড়ে-ওঠা সৌরভের মধ্যে বসে, শুদ্ধ সংবহনে কান পেতে,
শৃঙ্খল আর কারনেসনে সুসজ্জিত হয়ে যে-ই আসে
লক্ষ্যহীন তাকে পথ ছেড়ে দিই,
তখনও অবশিষ্ট যতটুকু নীতিবোধ সহ্য করে নিয়ে স্বপ্ন দেখি।

অকস্মাৎ বলে কিছু নেই, না ভঙ্গুর-হৃদয় কিংবা উদ্ধত ভঙ্গিমা,
সবই দারিদ্র্যের মতো আশ্চর্য সুস্পষ্ট, অবশ্যম্ভাবী,
চোখের পাতা থেকে বিচ্ছুরিত এ পৃথিবীর আলো,
ঠিক উদাত্ত ঘণ্টাধ্বনির মতো নয়, বরং কিছুটা অশ্রুর মতো টলটলে
এ দিনটির পোশাক আদৌ ঠাস-বুনানি নয়
বরং এমনই অপলকা যে পটি বাঁধার কাজ চলে,
দীর্ঘ অনুপস্থিতির পর বিদায়বেলায় রুমাল নাড়ার কাজে,
রঙটা তার এমনই বিশ্রী যে নিজেকে পালটে নিতে চায়,
নিজেকে ঢাকতে, সম্পূর্ণ লীন করে দিতে কিংবা দূরত্ব বাড়াতে।

নড়বড়ে জীর্ণ বস্তুপুঞ্জের মধ্যে আমি একা
আমার ওপরে বৃষ্টি ঝরে পড়ে, প্রলাপে গর্জনে
মৃত এ পৃথিবীতে যে বৃষ্টি ঠিক আমারই মতো নিঃসঙ্গ একা,
যার নির্দিষ্ট কোনো অবয়ব নেই, পতনে প্রত্যাখ্যাত।

কাব্যকৃতি

ছায়া আর আকাশ, নগররক্ষী আর কুমারী মেয়েদের মাঝে,
ছন্নছাড়া হৃদয় আর ভয়ংকর সর্বনাশা স্বপ্ন বুকে নিয়ে,
চকিতে বিবর্ণ ম্লান, কপালে ফুটে ওঠে নষ্ট বলিরেখা
তিরিক্ষি-মেজাজ বিপত্নীকের মতো হারানো জীবনের প্রতি দৈনন্দিন শোকে—
হায়, ঘুমঘোরে মগ্ন যে জল, আমি পান করি তার প্রতিটা অদৃশ্য বিন্দু
আর কানে আসে যে শব্দ, প্রতিনিয়তই তা কেঁপে ওঠে,
আমি লালন করি সেই একই বিতৃষ্ণা, একই হিম জ্বর,
সদ্যজাত শব্দ, ভয়ংকর কুটিল যন্ত্রণা এক—
যেন ত্রস্ত ধেয়ে আসে তস্কর কিংবা দৈত্যদানো,
যারা অতলান্ত গভীর খোলসে মোড়া,
যেন অপমানিত কোনো গোলাম, কিংবা বেসুরো ফাটা ঘণ্টাধ্বনি,
যেন মলিন পুরনো আয়না, কিংবা পরিত্যক্ত বাড়ির সোঁদা গন্ধ
রাত্তিরে যার বাসিন্দারা আসে নেশায় একেবারে চুর হয়ে,
মেঝেয় ছড়ানো বাসি জামাকাপড়ের গন্ধ
আর ফুলেদের প্রতি অসীম মমতা—
হয়তো অন্যভাবে বললে বিষণ্ণতার ভাবটা একটু কমে,
কিন্তু যা নির্মম সত্যি, তা হলো বাতাস আমার বুকে ঝাপটা মারে,
রাত্রির সীমাহীন আকাশ হুড়মুড়িয়ে ঢুকে পড়ে আমার শোবার ঘরে,
আত্মদানের ভঙ্গিতে জ্বলে ওঠে দিনের কোলাহল,
নিতান্তই বিষাদে ওরা চায় আমার মধ্যে যে দ্রষ্টা আছে তাকে,
আর তখনই শুরু হয়ে যায় বস্তুতে বস্তুতে সংঘাত
বিরামবিহিন আন্দোলন, যার নাম এখনও আমার অজানা।

নিঃসঙ্গ মৃত্যু

নির্জন কবরখানা
স্মৃতিস্তম্ভগুলো নিঃশব্দ অস্থিতে পরিপূর্ণ,
অন্ধকার সংকীর্ণ গুহার মধ্যে দিয়ে হৃদয় যায় আসে :
যেন জলমগ্ন এক জাহাজের খোলের মধ্যে আমরা মারা গেলাম
যেন হৃদয়ের অতলান্তে আমরা তলিয়ে গেলাম
যেন সত্তার আপন অস্তিত্বে আমরা মিশে গেলাম।

অজস্র মৃতদেহ
ক্লেদাক্ত হিমেল পা,
পাঁজরে পাঁজরে জড়ানো মৃত্যু,
পবিত্র একটা শব্দের মতো
কুকুরবিহীন তীক্ষ্ণ চিৎকারের মতো
অশ্রু কিংবা বৃষ্টির আর্দ্রতায় ফুলে ওঠা কবরে নানা ঘণ্টাধ্বনির মতো।

কখনও কখনও, একা, আমি দেখি
কফিনগুলো খোলা পালে বিবর্ণ মৃতদের বয়ে নিয়ে চলেছে,
মৃত কুন্তলে জড়ানো নারী, দেবদূতের মতো শুভ্র রুটিওয়ালা,
বিষণ্ণ কেরানিবধূ,
কফিনগুলো নেমে গেলো মৃত্যুর খাড়াই নদীতে,
মদিরার মতো রক্তবর্ণ গাঢ় নদী, দারুণ খরস্রোতা,
মৃত্যুর শব্দে পালগুলো ফুলে উঠছে
পালগুলো ফুলে উঠছে মৃত্যুর নিঃশব্দ ধ্বনি প্রতিধ্বনিতে।

মৃত্যু এসে পৌঁছলো কলশব্দমুখর নদীবেলায়
পা-বিহীন একটা জুতোর মতো, মানুষবিহীন একটা পোশাকের মতো
আংটি আর আঙুলবিহীন হাতে কড়া নাড়বে বলে সে এসে পৌঁছলো
এসে পৌঁছলো মুখবিহীন জিভবিহীন কণ্ঠস্বরবিহীন কণ্ঠে চিৎকার করবে বলে।
কখনও প্রতিধ্বনিত হয় না তার পদপাতের শব্দ।

গাছের পাতার মতো তার পোশাকের খস্‌খস্‌ শব্দ।
আমি ঠিক জানি না, আমি খুব অল্পই বুঝি, আমি খুব কমই দেখি
তবু আমার মনে হয় তার গানের রঙ তরল বেগুনে,
যে রঙ মাটির সঙ্গে মিশে যায়,
কেননা মৃত্যুর মুখ
মৃত্যুর অপলক চোখের দৃষ্টি অবিকল সবুজ,
বেগুনে পাতার বিদীর্ণ আর্দ্রতায়
উন্মত্ত শীতের রঙ বিষণ্ন ধূসর।

অথচ পল্লবের ছদ্মবেশে মৃত্যু পৃথিবীর মধ্যে দিয়ে চলে যায়
মৃতের খোঁজে মাটি থেকে লাফিয়ে ওঠে,
মৃত্যু পল্লবে মুখ ঢাকে,
মৃত্যুর জিভ খোঁজে শবদেহ,
মৃত্যুর ছুঁচ খোঁজে সুতো।

মৃত্যু আমাদের দোলনার আশেপাশে
সস্তা মাদুরে, কালো কম্বলে মৃত্যু মাথা গুঁজে থাকে,
তারপর সহসা উধাও—
বিষণ্ন শব্দে চাদর দুলিয়ে সে চলে যায়
আর বিছানাগুলো পাল তুলে ভেসে যায় বন্দরের দিকে
যেখানে সম্রাটের মতো সুসজ্জিত পোশাকে প্রতীক্ষা করে থাকে মৃত্যু।

ভবঘুরে

আসলে ব্যাপারটা এই, মানুষ হয়ে আমি ক্লান্ত।
আসলে ব্যাপারটা এই, আমি দরজির দোকানে যাই, সিনেমা দেখি,
সবই দুর্ভেদ্য, নিরস, আদি আর অন্তের জলে
সাঁতরে বেড়ানো জমাট-পশমী এক মরালের মতো।

নাপিতের দোকানের গন্ধে আমার ডাক ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছে করে।
শুধু পাথর কিংবা পশমের একটু আরাম ছাড়া আমি আর কিছুই চাই না,
আমি আর দেখতে চাই না বাগবাগিচা, গৃহস্থালি,
বিকিকিনির পসরা, রঙিন কাচ আর বৈদ্যুতিক সিঁড়ি।

আসলে ব্যাপারটা এই, আমার পা আর নখ নিয়ে আমি ক্লান্ত
চুল আর আমার ছায়া নিয়ে।
আসলে ব্যাপারটা এই, মানুষ হয়ে আমি ক্লান্ত।

কোনো মুহুরিকে কাটা পদ্ম ছুঁড়ে ভয় দেখাতে দারুণ মজা লাগবে
কিংবা কান চাড়িয়ে কোনো মঠবাসিনীকে একেবারে মেরে ফেলতে।
সত্যিই বেশ সুন্দর হবে সবুজ ছুরি নিয়ে পথে পথে ঘুরে বেড়াতে
আর ঠাণ্ডায় জমে না যাওয়া পর্যন্ত চিৎকার চেঁচামেচি করতে।

অন্ধকারে একটা শেকড় হয়ে আমি বেঁচে থাকতে চাই না,
দোদুল্যমানতায় টান টান হয়ে শুয়ে থাকতে, স্বপ্নে কেঁপে উঠতে,
নত মুখে পৃথিবীর সজল নাড়িভুঁড়ির মধ্যে প্রবেশ করতে,
তাকে শুষে নিতে, প্রতিদিন শুধু খেতে আর এফোঁড় ওফোঁড় হয়ে ভাবতে।

আমি চাই না এতগুলো দুর্ভাগ্যের উত্তরাধিকারী হতে।
আমি চাই না যন্ত্রণায় মুমূর্ষু, ঠাণ্ডায় জমে কাঠ হয়ে যাওয়া
মাটির নিচে একগাদা মৃতদেহের মতো, নির্জন একটা সুড়ঙ্গের মতো
কেবল একটা শেকড় কিংবা স্মৃতিস্তম্ভের মতো হয়ে বেঁচে থাকতে।

এই জন্যেই সোমবারগুলো আমার তেলের মতো জ্বলে ওঠে
যখন সে আমাকে জেলফটকের মতো থমথমে মুখে এসে পেঁছতে দ্যাখে,
আহত চাকার মতো সে ক্রুদ্ধ গর্জন করে ওঠে,
তারপর উষ্ণ রক্তে পা ফেলে ফেলে রাত্রির দিকে চলে যায়।

সে আমাকে স্যাঁতসেঁতে বাড়ির নির্দিষ্ট একটা কোণে ঠেলে দেয়,
হাসপাতালে যেখানে জানলা দিয়ে হাড়গুলো বেরিয়ে আসে,
সিরকার টকসা গন্ধভরা কোনো মুচির দোকানে
কিংবা ভয়ঙ্কর ফাঁকফোকর খানাখন্দ ভরা রাস্তায়।

এমন অনেক পাখি আছে যাদের রঙ গন্ধক আর বিশ্রী নাড়িভুঁড়ির মতো
আমি ঘৃণা করি এমন সব বাড়ির দরজায় ওরা ঝুলে থাকে,
কফির পাত্রে ভুলে যাওয়া ঝুটো দাঁতের পাটি,
আর এমন সব আয়না আছে লজ্জা আর ভয়ে যাদের কাঁদা উচিত,
চারদিকে ছড়ানো ছাতা, নানা ধরনের বিষ আর নাভিকুণ্ডলী।

শান্ত স্থির চোখ মেলে জুতো পায়ে আমি ঘুরে চলি,
প্রচণ্ড রাগে ফুলতে ফুলতে, কখনও বা বিস্মরণে,
হেঁটে যাই কোটকাছারি আর অস্থিবিদদের দোকানের পাশ দিয়ে,
কখনও বা উঠোনের মধ্যে দিয়ে যেখানে তারে তারে কাপড় শুকোয়
অন্তর্বাস, তোয়ালে আর কামিজ—
যারা নীরবে চোখের জল ফ্যালে।

শোকগাথা

মেয়ে, আহা, গোলাপবনের মেয়ে, ঘুঘুর কোমল উষ্ণতা,
বন্দী মাছ আর রক্তগোলাপ,
তৃষ্ণার্ত লবণ ভরা তোমার হৃদয়
গুচ্ছ গুচ্ছ আঙুরের মতো মসৃণ তোমার ত্বক।

ভাবতেও খারাপ লাগছে তোমাকে দেবার মতো আমার কিছুই নেই
কেবল আঙুলের নখ, চোখের পল্লব আর ভালোবাসায় গলে যাওয়া
পিয়ানোগুলো ছাড়া, কিংবা হৃদয় উপচে-ওঠা স্বপ্ন,
কালো ঘোড়ার মতো ছুটে আসা ধুলোয় ধূসর সেই স্বপ্ন,
গতিচঞ্চল আর দুর্ভাগ্য জড়ানো দুর্বিষহ সেই স্বপ্ন ছাড়া।

আমি তোমাকে ভালোবাসতে পারি কেবল চুম্বন আর পপি দিয়ে,
বৃষ্টি-ভেজা সিক্ত ফুলের মালা দিয়ে,
আমার চোখ হলদে কুকুর আর ঘোড়ার জ্বলজ্বলে আরক্ত চোখের মতন।
কাঁধের ওপর ঢেউয়ের দাপট নিয়ে তোমাকে ভালোবাসতে পারি
গন্ধকের তীক্ষ্ন স্বনন আর ভাবনায় তলিয়ে যাওয়া গহন জলরাশির মধ্যে,
বিষণ্ণ চুলবালি খসা, ভিজে ঘাস গজিয়ে ওঠা যে স্মৃতিস্তম্ভগুলো
নদীতে ভেসে গেছে
তার বিপরীত তীর সাঁতরে,
জলমগ্ন হৃদয় আর কবর-না-দেওয়া শিশুদের মৃতদেহ পেরিয়ে।

আমার অসহায় তৃষিত চাওয়া, আমার নিঃসঙ্গ চুম্বনে
কত না মৃত্যুর খেলা, কত না শবযাত্রার ঘটনা,
আমার মাথায় ঝরে পড়ে জলের ধারা,
বেড়ে ওঠে চুল,
সময়ের মতো শৃঙ্খলহীন কালো জলের ধারা
তার নৈশ কণ্ঠস্বর যেন বৃষ্টিতে ভেজা পাখির কান্না,
তার সিক্ত ডানার অফুরন্ত ছায়া

যা আড়াল করে রাখে আমার অস্থিপুঞ্জকে :
আর আমি যখন পোশাক পালটাই
যখন আয়না আর জানলার শার্সিতে নিজের ছায়া দেখি,
তখন শুনতে পাই কেউ আমার পিছু নিয়েছে,
কান্নার মতো করুণ স্বরে কেউ আমাকে ডাকছে ।

আর তুমি দাঁড়িয়ে আছো মাটিতে
ঝকঝকে সাদা দাঁতে বিদ্যুৎচমকের মতো হাসছো ।
তুমি প্রসারিত করো চুম্বন, দলে পিষে ফেলো পিঁপড়েদের ।
সুস্বাস্থ্য, পিঁয়াজ, মৌমাছি আর জ্বলন্ত বর্ণমালার জন্যে
তুমি চোখের জল ফ্যালো ।
তুমি যেন ইস্পাতের গাঢ় সবুজ এক তরবারি,
একটু ছোঁয়াতেই নদীর ঢেউয়ের মতো তিরতির করে কেঁপে ওঠো

শুভ্র বসনে তুমি এসো আমার সত্তায়
রক্তগোলাপের একটা শাখা আর এক-কমণ্ডলু চিতাভস্ম নিয়ে,
অপেল আর একটা ঘোড়া নিয়ে,
কেননা অন্ধকার ঘরে আলোর একটা ঝাড়
শীতের প্রতীক্ষায় ভাঙাচোরা কয়েকটা কুর্সি
নম্বরীওয়ালা মরা একটা পায়রা ছাড়া এখানে আর কিছুই নেই ।

ফিরে আসে শরৎ

ঘণ্টাগুলো থেকে ঝরে পড়ে বিষণ্ণ একটা দিন
যেন শোকমগ্ন বিধবার বেপথু ওড়না,
রংটা ঠিক যেন
মাটিতে মুখ গুঁজে পড়ে থাকা চেরির স্বপ্ন.
জল আর চুম্বনের রংকে পালটে দেবে বলে
বিরামবিহীন ফিরে আসে নীলাভ ধোঁয়ার কুণ্ডলী।

জানি না আমি ঠিক স্পষ্ট বোঝাতে পারছি কি না :
মাথার ওপরে যখন রাত্রি ঘনায়,
যখন নিঃসঙ্গ কবি
জানলায় শুনতে পায় শরতের ধাবন্ত অশ্বখুরধ্বনি
আর তার ধমনীতে প্রতিধ্বনিত হয় পদদলিত পাতার মর্মর,
আকাশে এমন কিছু আছে যা ষাঁড়ের জিভের মতো ঘন
আব পারিপার্শ্বিকতার মতো সন্দেহে দোদুল্যমান।

সবকিছুই যে যার নিজের জায়গায় ফিরে আসে-
নিতান্তই অপরিহার্য এমনি সব আইনজীবী, শক্তসামর্থ্য হাত.
জলপাইয়ের তেল, মদের বোতল.
বেঁচে থাকার প্রতিটা চিহ্ন.
সবার আগে যা ফিরে আসে
থিকথিকে তরল রক্তে ভরে থাকা সেইসব শয্যা
যেখানে নোংরা কানগুলোয় লোকেরা ঢেলে দেয় তাদের
যাকিছু গোপনীয়তা।
আততায়ীরা সিঁড়ি দিয়ে নেমে যায়
যদিও আগের মতো টগবগিয়ে চলা, ব্যাপারটা ঠিক তা নয়,
তবু কোনো রকমে কাঁপতে কাঁপতে টিকিয়ে টিকিয়ে চলেছে শরতের বুড়ো ঘোড়াটা।

ঝাঁকড়া বাদামী কেশর ফোলানো শরতের বুড়ো ঘোড়াটার

দুকষ ঢেকে আছে বীভৎস সাদা ফেনায়,
আর তার পিছু ধাওয়া করা বাতাসের গড়নটা ঠিক মানুষের মতন,
সারা গায়ে গলাচপা শবের বিশ্রী সুগন্ধ।

প্রতিদিনই আকাশ থেকে ঝরে ঝরে পড়ে এক পাংশুল রং,
ডানায় ডানায় পারাবতেরা যা ছড়িয়ে দেয় পৃথিবী এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত
ভুলে যাওয়া দড়ি, কান্নার ঢেউ আর সময়
বছরের পর বছর যা ঘুমিয়ে ছিলো ঘণ্টার মধ্যে,
সব সবকিছু,
পোকায়-কাটা জীর্ণ পোশাক, তুষারপাত দেখতে আসা রমণী,
না মরলে যাদের দেখা যায় না সেই কালো আফিমের ফুল,
সব সবকিছুই এসে পড়ে বৃষ্টির মধ্যে তুলে ধরা আমার হাতে।

ভোলা যায় না

যদি আমায় জিগেস করো এতদিন কোথায় ছিলুম
তখন আমাকে বলতেই হবে, 'এ রকমটাই হয়।'
বলতে হবে পাথরের ছায়ায় ঢাকা রুক্ষ মাটির কথা,
নদীর কথা, অসীম ধৈর্য ধরে যে নিজেকে নিঃশেষ করে ফেলেছে :
পাখিরা যা হারিয়েছে সেসব আমি কিছুই জানি না,
জানি কেবল পেছনে ফেলে আসা এক সমুদ্র
আর আমার বোনের কান্না।
কেন যে এত অচেনা প্রান্তর, একটা দিন আর একটা দিনের সঙ্গে গাঁথা ?
কেন যে এত কালো রাত্রি ঘনায় আমাদের মুখের চারপাশে ?
কেন যে এত মৃতদেহ ?
যদি আমায় জিগেস করো কোথা থেকে এলুম
তখন আমাকে বলতেই হবে
ভাঙাচোরা জিনিস

আর তীব্র যন্ত্রণাদায়ক বাসনপত্রের কথা,
ধুলোয় লীন হয়ে যাওয়া বিশাল যত প্রাণী
আর শোকার্ত হৃদয়ের কথা।

না, পরস্পরকে যাকিছু অতিক্রম করে গেছে সবই স্মৃতি নয়,
না আমাদের বিস্মরণে ঘুমিয়ে পড়া হলদে রঙের পায়রা :
এরা সব অশ্রুসজল মুখ
গলার মধ্যে যাদের আঙুল ঠাসা,
এরা তাই যা পাতা থেকে টুপটাপ মাটিতে ঝরে যায় :
এরা আমাদেরই বিষণ্ণ রক্তে লালিত
মিলিয়ে যাওয়া একটা দিনের অন্ধকার।

যাকিছু আমাদের অসম্ভব ভালো লাগে
প্রাণ ছলবলে দোয়েল আর গুচ্ছগুচ্ছ ভায়োলেট,
সে এক আশ্চর্য মিষ্টি ছবি
যার মধ্যে মাধুর্য আর সময় একই সঙ্গে যায় আর আসে।

অথচ, না, ওইসব দাঁতের ওপারে না যাওয়াই ভালো :
কি হবে মিছিমিছি নৈঃশব্দ্যের নিটোল খোলসে দাঁত বসিয়ে ?
কেননা জবাবটা কি হবে আমার জানা নেই :
কত না মৃত্যু,
কত না সমুদ্র-বাঁধ বিদীর্ণ সূর্যের আরক্ত আলোয়,
কত না মাথা আহত নৌকার গায়ে ঠুকে,
কত না হাত ঢেকে দেয় আমাদের মিলিত চুম্বন,
এমনি আরও কত কিছু আমি সম্পূর্ণ ভুলতে চাই।

মাদ্রিদ, ১৯৩৬

মাদ্রিদ নিঃসঙ্গ আর পবিত্র, অবনমিত মৌচাকের বিপুল আনন্দে গ্রীষ্ম তোমাকে
চিরদিনই বিস্মিত করে·
উজ্জ্বল তোমার রাজপথ, তোমার স্বপ্ন।
সেনানায়কদের
কালো বমি, যাজকীয় পোশাকের ক্ষিপ্ত ঢেউ
তোমার দু হাঁটুর মাঝে ঢাললো
তাদের পঙ্কিল জলধারা. তাদের বিশ্রী থুতুর নদী।

তখনও ঘুমে জুড়ে আসা দু চোখ,
পাথর আর রাইফেলে তুমি আবার নতুন করে আহত হলে মাদ্রিদ,
নিজেই নিজেকে ঠেকালে।
রাস্তায় রাস্তায় তুমি ছুটে গেলে
রেখে গেলে তোমার পবিত্র রক্তের চিহ্ন,
ছত্রভঙ্গ লড়ুয়েদের আবার সমবেত করলে. ডাক দিলে সমুদ্র গর্জনে,
তোমার মুখ এমনই আশ্চর্য
যা রক্তের আলোয় চিরদিনের মতো বদলে যায়.
যেন প্রতিহিংসু কোনো পাহাড়,
যেন ছুরির সিটি-মারা সব নক্ষত্র।

অন্ধকার যত ছাউনি আর বিশ্বাসঘাতকতার মালগুদমে
যখন প্রবেশ করলো তোমার জ্বলন্ত তরবারি,
চারদিক জুড়ে নেমে এলো ভোরের এক নিটোল নৈঃশব্দ্য,
তোমার রক্তনিশানের গাঢ় অধিকার
আর তোমার উজ্জ্বল হাসিতে রক্তের একটা ফোটা।

বুঝিয়ে দিচ্ছি কয়েকটা ব্যাপার

তোমরা জিগেস করবে : কোথায় গেলো সেই লাইলাক ফুল ?
কোথায় গেলো আফিম ফুলের পাপড়িতে পাপড়িতে ছাওয়া আত্মদর্শন ?
আর প্রায়ই আকাশ ঝামরে আসা সেই অঝর বৃষ্টিধারা
যে তার কথাগুলোকে ফাঁকফোকর
আর পাখপাখালিতে ঠেসে রাখতো ?
আমি তোমাদের ব্যাপারগুলো সব বুঝিয়ে দিচ্ছি।

আমি বাস করতুম
মাদ্রিদের এক উপকণ্ঠে, যেখানে ঘণ্টা ছিলো
ঘড়ি ছিলো, গাছ ছিলো।

ওখান থেকে চোখে পড়তো
কাস্তিলের শুকনো মোহনা পেরিয়ে
চামড়ার মতো মসৃণ সমুদ্র।
সবাই আমার বাড়িটাকে বলতো
ফুলের বাড়ি, কেননা বাড়ির চারদিক
জেরেনিয়াম ফুলে ফুলে যেন উপছে উঠতো :
সত্যিই বাড়িটা ভারি চমৎকার দেখতে,
সবসময় কুকুর আর বাচ্ছারা ঘুরঘুর করতো।

রাউলকে কি তোমার মনে পড়ে ?
রাফায়েলকে ?
মাটির নিচের গোপন আস্তানা থেকে
তোমার কি মনে পড়ে, ফেদেরিকো
আমার ঝুলনো বারান্দাগুলো
যেখানে গ্রীষ্মের উজ্জ্বল সূর্যালোক তোমার মুখে পাপড়ির মতো ঝরে ঝরে পড়তো ?
ভাই, ভাই আমার !

সবই চড়া সুরে বাঁধা
দরাজ কণ্ঠস্বর, কেনাবেচার রসদ,
সুস্বাদু রুটির পাহাড়, আমার আরগুয়েলের
শহরতলির হাটে স্তূপাকার হেক মাছ,
পলায় পলায় চলতো তেলের মাপনি,
বিস্তর হৈ-হট্টগোল
আর গুলতানিতে ভরে উঠতো রাস্তাঘাট,
মিটার, লিটার, জীবনের যত
সূক্ষ্ম মাপজোখ,

পাহাড়প্রমাণ জমে ওঠা মাছ,
হিমেল সূর্যে ঠাসবোনা যত ঘরবাড়ির ছাদ
যেখানে আবহাওয়ার কোনো তারতম্য প্রায় হয় না বললেই চলে,
হাতির দাঁতের মতো মসৃণ আলু,
আর সমুদ্রের দিকে গড়িয়ে চলা টমেটোর ঢেউ।

হঠাৎ একদিন সকালে সবকিছু দাউ দাউ জ্বলে উঠলো,
হঠাৎ একদিন সকালে মাটি থেকে লাফিয়ে উঠলো বহ্ন্যুৎসব—
গোগ্রাসে গিলতে লাগলো মানুষ,
তার পর থেকে শুধু আগুন, আগুন আর আগুন,
তার পর থেকে শুধু বারুদ আর রক্ত।

উড়োজাহাজ আর মুরদের সঙ্গে নিয়ে এলো দস্যুদল,
আংটি আর শাহাজাদীদের সঙ্গে নিয়ে এলো দস্যুদল,
আশীর্বাদ জানাবে বলে কালো ধর্মযাজকদের সঙ্গে নিয়ে এলো দস্যুদল,
আকাশ থেকে ওরা নেমে পড়লো শিশুদের খুন করবে বলে,
রাস্তায় রাস্তায় শিশুর রক্তে বন্যা বয়ে গেলো,
কোথায় কোনো বাধা নেই, অবিকল শিশুর রক্তেরই মতো অনায়াস ভঙ্গিতে

শিয়ালও যাদের দেখে ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নেবে এমনি সব শিয়াল,
শুকনো কাঁটাগাছও যাদের মুখ থেকে উগরে দেবে এমনি সব পাথর,

বিষধর কেউটেও যাদের দেখে নাক সিঁটকোবে, ওরা এমনিই সব হিংস্র

তোমাদের সঙ্গে সামনাসামনি আমিও উঠে আসতে দেখেছি
ঢেউয়ের মতো উত্তাল স্পেনের রক্তধারা
ঔদ্ধত্য আর ছুরির ঊর্মিমালায়
তোমাদের তলিয়ে দিতে !

বেইমান
সব সেনাধ্যক্ষ ·
তোমরা দেখ আমার বাড়িটা নিহত
স্পেন ক্ষতবিক্ষত :
তবু
ফুলের বদলে
প্রতিটা মৃত বাড়ি থেকে ফিনকি দিয়ে ছুটছে জ্বলন্ত ধাতু,
স্পেনের প্রতিটা ফোকর থেকে
ঠিকরে বেরুচ্ছে
স্পেন,
প্রতিটা নিহত শিশুর থেকে জন্ম নিচ্ছে এক একটা শ্যেন-দৃষ্টি রাইফেল,
প্রতিটা পাপ থেকে জন্ম নিচ্ছে এক একটা বুলেট
যা একদিন খুঁজে পাবে
অব্যর্থ-লক্ষ্য তোমার হৃদ্‌পিণ্ড।

যদি তুমি জানতে চাও : কেন তার কবিতায়
স্বপ্ন,
পাতা
আর তার দেশের
বড় বড় সব আগ্নেয়গিরির কথা থাকে না ?
তাহলে এসে দেখে যাও রাস্তায় রাস্তায় রক্ত,
এসে দেখে যাও রাস্তায় রাস্তায় রক্ত,
রাস্তায় রাস্তায় গড়িয়ে যাওয়া রক্তের ধারা !

নিহত সংগ্রামীদের মায়েদের জন্যে গান

ওরা মৃত্যুহীন ! গোলাবারুদের ঠিক মাঝখানে
জ্বলন্ত সলতের মতো
ওরা মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে রয়েছে ।

তামাটে-রঙ বিস্তীর্ণ ঘাসের প্রান্তরে
ওদের পবিত্র ছায়াগুলো মিশে গেছে
যেন সাঁজোয়া বাতাসের এক যবনিকা.
যেন প্রচণ্ড ক্রোধের রঙের এক অবরোধ,
যেন নিজেই আকাশের এক অদৃশ্য হৃদয় ।

মাগো, ওরা দাঁড়িয়ে রয়েছে গমের ক্ষেতে,
ভরা দুপুরের মতো সুদীর্ঘ.
বিস্তীর্ণ সারাটা প্রান্তর জুড়ে ওদের আধিপত্য !
কালো ঘণ্টাধ্বনির মতো উদাত্ত গম্ভীর ওদের কণ্ঠস্বর
ঝকঝকে ইস্পাতের ফলায় নিহত মৃতদেহ পেরিয়ে
বয়ে আনছে বিজয়বার্তা ।
ধুলোয়-মুখ থুবড়ে পড়া
ছিন্নভিন্ন হৃদয় বোনেরা,
তোমার নিহত সংগ্রামী ভাইয়েদের ওপর আস্থা রেখো ।
রক্তে ভেজা পাথরের নিচে ওরা
কেবলমাত্র শেকড় নয়.
ওদের ভাঙাচোরা অস্থি
কেবল মাটিকেই উদ্বেল করে তুলছে না.
মুখগুলোও ওদের কামড় বসাচ্ছে শুকনো বারুদে.
লোহ-সমুদ্রের মতো আক্রমণে ঝাঁপিয়ে পড়ছে,
এমনকি ওদের উদ্ধত মুষ্টি অস্বীকার করছে মৃত্যুকেও ।
কেননা এতগুলো মৃতদেহ-থেকে উঠে এসেছে
অদৃশ্য একটা জীবন ।

জীবনেরই মতো সজীব একটা দেহ :
চোখ-উপড়ে-নেওয়া একটা মুখ অন্ধকারের দিকে অপলক তাকিয়ে রয়েছে
যেন পার্থিব আশায় দীপ্ত একটা তরবারি।

ছুঁড়ে ফেলে দাও
তোমার শোকের কারুকার্য করা ওড়না, সঞ্চিত করো তোমার
প্রতিটা অশ্রুবিন্দু, যতক্ষণ না তারা হয়ে ওঠে একটা মারাত্মক অস্ত্র :
যা দিয়ে আমরা দিনরাত আঘাত হানতে পারি,
লাথি মারতে পারি, থুথু ছিটোতে পারি
যতদিন না ঘৃণার দরজাগুলো মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়ে !
তোমার করুণ দুর্ভাগ্যকে আমি ভুলিনি,
আমি চিনি তোমার সন্তানদের,
ওদের মৃত্যুবরণে যদি আমি গর্বিত হয়ে থাকি
ওদের উজ্জ্বল জীবনের জন্যেও আমি গর্বিত।

নিস্তব্ধ কলকারখানা
ফেটে পড়তো ওদের মুখর কলহাস্যে,
পাতাল-রেলপথগুলোতে
প্রতিদিন শোনা যেতো ওদের পায়ের শব্দ ঠিক আমার পাশেই,
লেভান্তে কমলার ঝোপে, দক্ষিণাঞ্চলে মাছধরার জালে,
ছাপাখানার কালির গন্ধে, বাড়ি তৈরির মালমসলায়,
আগুন আর উদ্দীপনায় আমি ওদের হৃদয় দীপ্ত জ্বলে উঠতে দেখেছি।

মাগো, ঠিক তোমার হৃদয়ের মতো
আমার হৃদয়েও ছেয়ে আছে এত শোক, এত মৃত্যু
ঠিক যেন হাসতে হাসতে খুন হয়ে যাওয়া
রক্তে ভেজা একটা অরণ্য,
যে অরণ্য দিনের পর দিন নিঃসঙ্গ
নিদ্রাবিহীনতার প্রচণ্ড কুয়াশায় ঢেকে আছে।

অথচ
তৃষিত হায়নাদের জন্যে অভিশাপ, বর্বর মৃত্যু,
আফ্রিকা থেকে ভেসে-আসা হিংস্র গর্জন,
ক্রোধ, ভর্ৎসনা আর চোখের জল ছাপিয়ে
অসহ্য যন্ত্রণা, দুঃসহ মরণ-বিদ্ধ মায়েরা আমার
সদ্যজাত এই মহান দিনটার হৃদয়ের দিকে তাকাও,
জেনে রাখো, বিস্তীর্ণ গমের প্রান্তর থেকে উদ্ধত মুষ্টিবদ্ধ হাতে
তোমার মৃত সন্তানরা হাসছে।

স্পেন যেমন ছিলো

স্পেন ছিলো ঊষর আর টানটান,
দৈনন্দিন মাদলে তার দ্রিমি দ্রিমি বোল,
সমতলভূমি, ঈগলের বাসা, আর বিক্ষুব্ধ ঝড়ের
থমথমে নৈঃশব্দ্য।

চোখে জল এসে যায়, ভরে ওঠে সারা বুক,
কত যে ভালোবাসি তোমার রুক্ষ মাটি, তোমার শক্ত রুটি,
তোমার নিপীড়িত মানুষ! কেমন করে যে আমার সত্তার গভীরে
পুষ্পিত হয়ে ওঠে তোমার অবিলোপী
উঁচু-নিচু গ্রামের হারানো ফুলগুলি,
অক্ষম দেবতার লোলুপ গ্রাসের মতো
চাঁদের আলো আর সময়ের বুকে বিস্তীর্ণ তোমার
খনি অঞ্চল।

ভালোবাসি তোমার যাকিছু স্থাপত্য, তোমার বর্বর নির্জনতা,
নৈঃশব্দ্যের বিমূর্ত পাথরে ঘেরা তোমার দুর্লভ প্রতিভা,
তোমার তেতো মদ, তোমার মিঠে মদ,

তোমার অসহ্য মিষ্টি
আঙুরলতা।

সূর্যের জ্বলজ্বলে পাথর, দুনিয়ার যত দেশ
তার মধ্যে সবচেয়ে সেরা স্পেন,
রক্ত আর ধাতু, নিগ্রো আর বিজয়ীতে ভরা,
ফুলের পাপড়ি আর বুলেটে সর্বহারা,
আশ্চর্য জীবন্ত,
সুস্থির, স্পন্দিত।

মাদ্রিদে প্রবেশ করলো আন্তর্জাতিক সেনাবাহিনী

দারুণ কনকনে শীতের এক সকাল,
কাদা আর ধোঁয়ায় ভরা এ মাসটা সত্যিই ভাবি কষ্টের,
হাঁটুবিহীন একটা মাস, অবরোধ আর দুর্ভাগ্যের বিষণ্ণ একটা মাস,
যখন আমার বাড়ির ভিজে শার্সির মধ্যে দিয়ে শোনা যেতো
রাইফেল আর রক্তমাখা দাঁতে
আফ্রিকার শিয়ালগুলোর হিংস্র চিৎকার,
যখন আশা বলতে বারুদের স্বপ্ন ছাড়া আমাদের আর কিছুই ছিলো না,
যখন আমরা প্রায় ভাবতে শুরু করেছিলুম
পৃথিবীটা ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর সব দৈত্য-দানোতে ভর্তি,
ঠিক তখনই, মাদ্রিদে শীতের তুষার ভেদ করে
ভোরের কুয়াশা ছিঁড়ে
আমার এই চোখদুটো আর হৃদয় দিয়ে স্পষ্ট দেখলুম
একনিষ্ঠ যোদ্ধারা এসে পৌঁছলো,
শীর্ণ অথচ কঠিন, কোমল অথচ জ্বলন্ত পাথরের মতো ভীষণ।

সে এক ভয়ঙ্কর দুঃসময়

যখন মেয়েদের
গনগনে কয়লার মতো বুকে বয়ে নিয়ে বেড়াতে হতো অসহ্য বিরহ,
আর ঐশ্বর্যময়ী ফসলের সম্মানে গরবিনী মাঠে মাঠে
স্পেনীয় মৃত্যু, অন্য মৃত্যুর চেয়ে সে বড় নির্মম, অসম্ভব দৃষ্টিকটু।

রাস্তায় রাস্তায় মানুষের বাঁধভাঙা রক্ত
ঘরবাড়ির ভাঙাচোরা হৃদয় থেকে উৎসারিত জলের ধারার সঙ্গে মিশে যেতো :
ছিন্নভিন্ন শিশুদের দেহাস্থি, মায়েদের হৃদয়বিদারক নৈঃশব্দ্য,
অসহায়দের চিরদিনের জন্যে বোজা চোখ—
এ সবই যেন বিষাদ আর হারানোর প্রতিমূর্তি,
যেন থুথু ফেলে নষ্ট করে দেওয়া একটা ফুলের বাগান,
এ সবই চিরকালের জন্যে খুন হয়ে যাওয়া নিবিড় প্রত্যয় আর কোমল কুসুম।
কমরেডরা আমার,
তখনই
তোমাদের দেখলুম,
এমনকি এখনও আমার চোখ জুড়ে ভরে আছে সেই গর্ব
কেননা ভোরের কুয়াশা ছিঁড়ে আমি তোমাদের কাস্তিলের পবিত্র ললাট স্পর্শ
করতে দেখলুম
ভোরের আগে ঘণ্টাধ্বনিরই মতো চুপিসাড়ে
অথচ দৃঢ় পদক্ষেপে,
দূরদূরান্ত থেকে আসা স্বপ্নিল চোখে আশ্চর্য এক পবিত্রতা নিয়ে,
গাঢ় মাধুর্য আর রাইফেল হাতে
নিভৃত গৃহকোণ, তোমাদের হারানো স্বদেশভূমি, তোমাদের নিবিড় স্বপ্ন পেরিয়ে
এসে পৌঁছিলে স্পেনের শহরকে রক্ষা করবে বলে
যেখানে জন্তুর হিংস্র থাবায়
অবরুদ্ধ স্বাধীনতাও প্রায় মৃত্যুমুখী।

ভাইরা আমার, এখন থেকে
তোমাদের পবিত্রতা, তোমাদের শক্তি, তোমাদের অনন্য কাহিনী
জানুক শিশু পুরুষ নারী বৃদ্ধ সবাই,

যারা আশাহত
তাদের কাছে পৌঁছোক তোমাদের এই বীরত্ব,
নেমে যাক গন্ধকের বাষ্পে ক্ষয়ে যাওয়া অন্ধকার খনিগর্ভে,
গোলামের অমানুষিক সিঁড়ি বেয়ে উঠে যাক ওপরে,
যেন প্রতিটা নক্ষত্র, যেন কাস্তিল আর এ পৃথিবীর প্রতিটা পুষ্পিত মঞ্জরি
লিখে রাখে তোমাদের নাম,
তোমাদের দাঁতে দাঁত দিয়ে লড়া সংগ্রাম,
শক্ত লাল ঝোড়গাছের মতো তোমাদের বিজয়।
যেহেতু আত্মাহুতি দিয়ে তোমরা উজ্জীবিত করেছো লুপ্ত বিশ্বাস,
হারিয়ে যাওয়া হৃদয়, পৃথিবীর যত আত্মপ্রত্যয়,
তোমাদের প্রাচুর্য, তোমাদের মহনীয়তা তোমাদের মৃতদেহ ছাপিয়ে,
যেন জমাট রক্তের পাথুরে উপত্যকা ছাপিয়ে
আশা আর ইস্পাতের ঘুঘুদের বুকে নিয়ে বয়ে চলেছে এক বিশাল নদী।

নির্যাতিত দেশ

অগণন শহীদের আত্মোৎসর্গে সমাচ্ছন্ন এই অঞ্চল,
সীমাহীন নিস্তব্ধতায়
মৌমাছি আর অবলুপ্ত পাহাড়ের স্পন্দনে,
গম আর ত্রিপর্ণীর চেয়ে দুর্লভ যে দেশ
এখানে ওখানে ছড়ানো তার অপরাধ আর শুকনো রক্তের দাগ :
সমৃদ্ধ গালেসিয়া, বৃষ্টির মতো স্বচ্ছ
চিরদিনই অশ্রুতে লবণাক্ত
এস্ত্রেমাদুরা, যার আকাশ আর এনামেলের রাজকীয় সমুদ্রসৈকতে,
বুলেটের কালো গর্তের মতো
প্রতারিত, আহত, বিধ্বস্ত যার সমুদ্রসৈকত
বাদাওস্ আজ স্মৃতিভ্রষ্ট শুয়ে, মৃত সন্তানদের বুকে নিয়ে
সে তাকিয়ে আছে আকাশের দিকে :

মৃত্যু আকীর্ণ
আর খাড়া পাহাড়ের পশ্চাদ্ধাবিত মালাগা,
যতক্ষণ না উন্মত্ত মায়েরা পাথরের ওপর আছড়ে মারে তাদের নবজাত শিশুদের
তীব্র ক্রোধ,
মৃত্যু আর নিনাদিত বিলাপ
যতক্ষণ না দুঃখ আর অশ্রু সম্মিলিত একসাথে,
যতক্ষণ না কথা, হতাশা আর ক্রোধ
রাস্তার মাঝখানে অস্থির স্তূপ হয়ে জমে ওঠে
কিংবা কবরের একটি পাথর সমাচ্ছন্ন পথের ধুলায়।

কত যে স্মৃতিস্তম্ভ, কত না আত্মোৎসর্গ, আহা,
নক্ষত্রের বুকে পশুদের পদসঞ্চার!
কিছু না,
এমন কি বিশাল একটা জয়ও
মুছে দিতে পারবে না রক্তের এই ভীষণ অতলতা :
কেউ না :
না সমুদ্র, না সময়, না প্রবাহিত বালি,
এমন কি কবরের মাটিতে প্রজ্বলিত কোনো জেরেনিয়ামও না।

সাঁজোয়া-বিধ্বংসী বীরদের প্রতি

শক্ত কড়ি-গাছের মতো ঋজু সাঁজোয়া-বিধ্বংসী বীরেরা
তোমাদের জন্যে রামধনুরাঙা ধ্রুপদী মন্ত্রের গুচ্ছ,
সমুদ্র আর আকাশের উজ্জ্বল জ্যোতিমণ্ডল
আর লরেলের ঝড়।
লড়ায়ের অন্ধকার দিনগুলোতে
তোমরা ছিলে আশ্চর্য সুন্দর, আগুনের দেবদূত,
এ পৃথিবীর পবিত্রতম সন্তান।

হ্যাঁ, ঠিক তাই, মাটির বুকে পোঁতা
কালো কালো অঙ্কুরের মতো তোমরা
বুকে বুক দিয়ে প্রতীক্ষা করছিলে। প্রচণ্ড ঘূর্ণিঝড় আসার আগে
দুশমনদের বুকে
চাবুকের মতো নির্মম,
বারুদের মতো ভয়ঙ্কর ক্রোধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলে।
এ পৃথিবী আর গৌরবের নগ্ন সন্তান
নিষ্ঠুরতার মৈনাকের বিরুদ্ধে
তোমরা মাথা তুলে দাঁড়িয়ে ছিলে।
অথচ একদিন
তোমাদের চোখের সামনে ফুটে উঠতো জলপাইয়ের স্তব্ধ অরণ্য,
টানা-জালগুলো ভরে উঠতো আঁশ আর রুপালী টুকরোয় :
একদিন তোমরা সঞ্চয় করতে
ফসল, ঘরবাড়ি তৈরির যন্ত্রপাতি, লোহা আর কাঠকুটো :
তোমাদের হাতে পুষ্পিত হয়ে উঠতো
ডালিমের আশ্চর্য সুন্দর অরণ্যানী, ভোরের পিঁয়াজকলি ·
তারপর হঠাৎ করেই একদিন
বিদ্যুতের চোখ ঝলসানো আলোয় দেখলে
কেবল গৌরবকে আঁকড়ে ধরে, প্রচণ্ড ক্রোধে ফেটে পড়তে পড়তে
তোমরা এখানে একা,

নির্মম অন্ধকারের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে রয়েছো।

খনিগহ্বর থেকে স্বাধীনতা তোমাদের চিৎকার করে ডাকলো,
প্রার্থনা করলো তোমাদের ফসলের শান্তি :
স্বাধীনতা কাঁদতে কাঁদতে এসে দাঁড়ালো
প্রশস্ত রাজপথে, বিলাপ করতে লাগলো গৃহস্থের দরজায় দরজায়
বাড়ির উঠোন থেকে তার কণ্ঠস্বর
প্রতিধ্বনিত হলো বাতাস আর কমলার ঝোপে,
ডাক দিলো পরিপূর্ণ-হৃদয় যত মানুষকে,
তোমরা তার ডাকে সাড়া দিলে,
বিজয়ের সুনির্বাচিত সন্তান, তাই আজ তোমরা এখানে,
বহুবার তোমরা মুখ থুবড়ে পড়েছো মাটিতে
বহুবার তোমাদের হাত নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে, ভেঙে গেছে
সবচেয়ে সুগোপন যে হাড়,
শান্ত স্থির তোমাদের মুখ
বহুবার চেষ্টা করেছো সেই নিস্তব্ধতাকে ভেঙে চুরমার করে দিতে :
তারপর হঠাৎ করে একদিন
সেই প্রচণ্ড ঘূর্ণিঝড়ের মাঝেই
তোমরা সবাই আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠলে
জাতির হৃদয়ের জ্বলন্ত দীপ্তি আর শিকড়ের অতল গভীরতা নিয়ে।

মাদ্রিদ, ১৯৩৭

এই মুহূর্তে আমার সবকিছু, সবাইকে মনে পড়েছে,
প্রতিধ্বনি আর পাখির পালকে সুসজ্জিত
সেইসব অঞ্চল—
যা এ পৃথিবীর বাইরে, অথচ এ পৃথিবীতেই এখনও বেঁচে রয়েছে
আজ থেকে শুরু হলো এক নতুন শীতের।

যাকিছু আমি ভালোবাসি

তাকে বুকে আঁকড়ে নিয়ে পড়ে থাকা এই শহর,
সেখানে রুটি নেই, আলো নেই,
শুকনো জেরেনিয়ামের বুকে আছড়ে পড়ে জানলার হিমেল ভাঙা সার্সির টুকরো
রক্তাক্ত ষাঁড়ের মতো ছোট কামানের গোলায় ছিঁড়ে যায় রাত্রির কালো দুঃস্বপ্ন :
শেওলাধরা দুর্গপ্রাচীরের নিশান্তিকায় কেউ নেই,
কেবল ভাঙা একটা ঠেলা
আর সুদীর্ঘ কালের নিটোল নিস্তব্ধতায়
জ্বলে পুড়ে খাক-হয়ে-যাওয়া বাড়িগুলোর নির্জন, আকাশের দিকে হা-মুখ
করা দরজা,
চড়ুয়ের পরিবর্তে সেখানে বয়ে যাচ্ছে রক্তের ধারা :
তার দুর্ভাগ্যের হীরে চুনী পান্নাকে কিনবে বলে এখন হাট বসেছে,
রক্তের নদী পেরিয়ে প্রতিদিনই বহে আনা হচ্ছে মাছ আর কমলা,
উপহার দেওয়া হচ্ছে বিধবা মা আর বোনেদের।
শোকের এই সারাটা শহর আজ আহত, অবসন্ন, গলিতে গলিতে ক্ষতবিক্ষত,
রক্ত আর ভাঙা কাচের টুকরোতে ছাওয়া,
সান্ত্বনা দেবার মতো তার কোনো রাত্রি নেই,
নৈঃশব্দ ভরা সারাটা রাত জুড়ে জেগে থাকে কেবল বীরের দল
আর বিস্ফোরণের উৎচকিত শব্দ।
আজ এ শহরে নতুন শীতটা আরও নগ্ন, আরও নিঃসঙ্গ,
এখন আর তার বাড়িগুলোর মেঝে নেই, সিঁড়ি নেই, কেবল জেগে থাকে
সংগ্রামীদের আশাভরা নিঃসঙ্গ চাঁদ।
জেগে থাকে সবাই, সবকিছু।
বেচারি সূর্য,
আমাদের হারানো রক্ত, শোকসন্তপ্ত ভয়ংকর হৃদয়।
ভারি বুলেটের মতো চোখের জল টুপটাপ ঝরে পড়ে তোমার অন্ধকার
মাটির বুকে, যেন আকাশ থেকে খসে পড়া নিহত ঘুঘু,
যেন একটা হাত, মৃত্যু যাকে চিরদিনের মতো স্তব্ধ করে দিয়েছে,
যেন প্রতি দিন প্রতিটা রাত প্রতি সপ্তাহ প্রতিটা মাসের গাঢ় রক্ত।
তোমার কথা কিছু না বলেই বীরেরা ঘুমিয়ে পড়ে

আবার জেগে ওঠে, তোমার কথা কিছু না বলেই তোমার মহতী উদ্দেশ্যে
ওরা জল আর মাটিকে কাঁপায় :
এই মুহূর্তে রাস্তায় দাঁড়িয়ে আমি আবহাওয়ায় কান পেতে শুনি,
কারা যেন আমার সঙ্গে কথা বলে, যেখানে বাস করতুম
সেইসব আস্তানায় আবার শীত এসেছে :
এই শহরের যাকিছু আমি শুনি, আর আগুনের বৃত্তে
ঘিরে থাকা সেইসব সুদূর
সবই যেন বিষাক্ত সাপের ফেনায় কলুষিত নরকের জলোচ্ছ্বাস।
আজ থেকে প্রায় বছর খানেক আগে
মুখোশ এঁটে যারা স্পর্শ করেছিলো তোমার মানবিক সৈকত
তোমার বৈদ্যুতিক রক্তের স্পর্শে তারা মারা গ্যাছে
মূর আর বিশ্বাসঘাতকদের লুঠ-করা মাল স্তূপাকার করে দিয়েছে তোমার
পাহাড়ের পাদদেশে
না ধোঁয়া না মৃত্যু
কেউই স্পর্শ করতে পারেনি তোমার জ্বলন্ত প্রাচীর।
তারপর,
তারপর কি হলো ?
হ্যাঁ, ওরা বিধ্বংসী, ওরা লোলুপ,
শুভ্রতার পবিত্র শহর, ওরা তোমার ওপর গুপ্তচরবৃত্তি চালালো—
বিশৃঙ্খল পোশাকের ধর্মযাজক, অপদার্থ আব সামন্ততন্ত্রী যত তরুণ প্রভু,
আর উৎশৃঙ্খল সেনানায়ক, মুঠো যাদের ভাঁত থাকে স্বর্ণমুদ্রায় :
তোমার প্রাচীর ঘিরে অসহায় অথচ সরল নারীদের বৃত্ত,
দূষিত কূটনীতিবিদদের ছোটখাটো একটা বাহিনী
আর সামরিক জন্তুদের মর্মান্তিক বমি।

আমি তোমার প্রশংসা করি মাদ্রিদ, স্তবগান করি মেঘ রোদ
স্বাস্থ্য আর তরবারির,
প্রশংসা করি তোমার রক্তাক্ত সীমান্তের
যার রক্তশিরা গভীর প্রতিধ্বনিত হয় আহত পাথরে,
বিদ্যুৎঝলকে সুসজ্জিত উজ্জ্বল দোলনার,

দুর্গপ্রাকার আর সেই রক্তিম বাতাসের
যা থেকে জন্ম নেয় মৌমাছি।

জুয়ান, তোমরা যারা
আজও বেঁচে আছো : পেদ্রো, তোমরা যারা আজও লক্ষ্য করছো :
আলোহীন রাতে আজও যাদের ঘুম নেই, বিশ্রাম নেই,
কেবল পাহারা দিয়ে চলেছে, একা.
কালো কাঁটাতার দিয়ে ঘেরা দূষিত বাতাস ভরা গুহার গোপন আস্তানায়,
দক্ষিণে, মধ্যাঞ্চলে, চারদিকে,
কোথাও কোনো আকাশ নেই, না রহস্য,
কেবল প্রতিরোধে প্রতিরোধে কোণ-ঠাসা মানুষ
আর দাউ দাউ আগুনের লেলিহান শিখা পরিবেষ্টিত শহর :
নাক্ষত্রিক আঘাতে, আগুনের প্রচণ্ড ধাক্কায় মাদ্রিদ আহত :
বিজয়ের গভীর নৈঃশব্দ্য জড়ানো এ মাটি
আর জাগরণ :
ত্রস্ত প্রকম্পিত
যেন অন্তহীন লরেলের চিরসবুজ গুল্ম দিয়ে ঘেরা
আহত একটা গোলাপ।

সংগ্রামী মুক্তিবাহিনীর প্রতি শৌর্যগাথা

সংগ্রামী মুক্তিবাহিনী ! এই যে, এখানে ! ছড়ানো আতঙ্ক আর অবরোধ
এখনও তোমার মাটিকে কলুষিত করে চলেছে,
তার সঙ্গে এসে মিশছে মৃত্যু, অঙ্কুশে অঙ্কুশে পৃথিবী ক্ষতবিক্ষত !

তোমাদের সুস্বাস্থ্য,
এ পৃথিবীর মায়েরা জানায় তোমাদের সুস্বাস্থ্য,
শিক্ষায়তন আর বৃদ্ধ ছুতোররা জানায় তোমাদের সুস্বাস্থ্য,
মুক্তিবাহিনী, ফুল দুধ আলু কমলা লরেল,
এ পৃথিবীর যাকিছু সম্পদ, যাকিছু মানুষের মুখে ওঠে, ওরা তাই দিয়েই

কামনা করে তোমাদের সুস্বাস্থ্য।

হাতে হাত দিয়ে গাঁথা

মালার মতো, স্পন্দিত একটা দেহের মতো, কঠিন বজ্রের মতো
সব সবকিছুই নিজে থেকে তোমাদের জন্যে প্রস্তুত!

ইস্পাতকঠিন দিন।

সামনে এগিয়ে চলো সংগ্রামী ভাইয়েরা আমার,
এগিয়ে চলো লাঙল-চষা জমির ওপর দিয়ে, এগিয়ে চলো
শুকনো খটখটে আর নিদ্রাবিহীন রাত ভোর করে,
জীর্ণ পোশাক আর উম্মত্ত প্রলাপে,
এগিয়ে চলো আঙুরবন পেরিয়ে, পাহাড়ের হিমেল রঙ মাড়িয়ে,
যেখানেই যাও সবাই কামনা করে তোমাদের সুস্বাস্থ্য।
শীতের চেয়ে আরও তীক্ষ্ন জনতার কণ্ঠস্বর,
চোখের পাতার চেয়ে আরও অনুভূতিপ্রবণ, বজ্রের প্রান্তভাগের চেয়ে
আরও অমোঘ,
ঠিক যেন কঠিন হীরকের মতো,
যুদ্ধের সময়ে যখন যেমন খুশি রূপ নাও, যোদ্ধারা,
কখনও মধ্য-অঞ্চলের তীব্র জলোচ্ছ্বাসের মতো
কখনও ফুল আর সুরার মতো, কখনও পৃথিবীর শৃঙ্খল হৃদয়ের মতো
কখনও প্রতিটা পাতার শেকড়ের মতো,
কখনও বা এ পৃথিবীর যাকিছু স্নিগ্ধ গন্ধের মতো।

তোমাদের সুস্বাস্থ্য, সৈনিক,

সুস্বাস্থ্য লালচে পোড়ো জমির, সুস্বাস্থ্য শক্ত ত্রিপর্ণীর,
সুস্বাস্থ্য বিদ্যুতের আলোয় স্তব্ধ হয়ে যাওয়া প্রতিটা শহরের,
সুস্বাস্থ্য তোমাদের সংগ্রামী মুক্তিবাহিনী,

এগিয়ে চলো, এগিয়ে চলো

এগিয়ে চলো খনির ওপর দিয়ে, কবরখানা মাড়িয়ে, মৃত্যুর বীভৎস
ক্ষুধার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে, বিশ্বাসঘাতকদের কুৎসিত আতঙ্কের মুখোমুখি
দাঁড়িয়ে,

জনতা, সত্যিকারের সংগ্রামী জনতা, রাইফেল আর হৃদয়,
হৃদয় আর রাইফেল নিয়ে এগিয়ে চলো।

আলোকচিত্রশিল্পী, খনিশ্রমিক, রেলপথ সারানো মজুর,
পাথর আর কয়লাখাদের দোস্ত, হাতুড়ির আত্মীয়-স্বজন, কাঠুরে
আর আমোদ-স্ফূর্তি করা যত মানুষ, সামনে এগিয়ে চলো,
গেরিলা যোদ্ধা, সেনানায়ক, পুলিস কর্মচারী, রাজনৈতিক প্রতিনিধি,
জনতার বৈমানিক, রাতের যোদ্ধা আর সমুদ্রে লড়ুয়েরা
, এগিয়ে চলো :

ওখানে কেবল মুমূর্ষু মৃত্যু,
ভয়ংকর রক্তাক্ত পুঁজের বদ্ধ জলা,
ওখানে কোনো শত্রু নেই, এগিয়ে চলো স্পেন, এগিয়ে চলো
মানুষের ঘণ্টাধ্বনি, এগিয়ে চলো আপেলবীজ,
এগিয়ে চলো ফসলের নিশান,
এগিয়ে চলো আগুনের দৌত্য,
কেননা সংগ্রামে, ঢেউয়ে, মাঠে-ময়দানে,
পাহাড়ে আর তিক্তগন্ধ জড়ানো গোধূলির আলোয়
তোমরা বহন করে নিয়ে চলেছো স্থায়িত্বের মর্যাদা,
কঠিন রুক্ষতার একটা কাহিনী।

ইতিমধ্যে,
খনিজক বিজয়ের জন্যে প্রতীক্ষা করে
নৈঃশব্দ্য থেকে উঠে আসা শিকড় আর মালা
প্রতিটা যন্ত্র, প্রতিটা লাল চাকা, প্রতিটা পাহাড় আম
কিংবা লাঙলের প্রতীকচিহ্ন, মাটির প্রতিটা উৎপাদন,
রক্তের প্রতিটা শিহরণ চায় তোমাদের প্রতিটা পায়ের চিহ্ন অনুসরণ করতে,
মুক্তিবাহিনী
তোমাদের নির্দেশিত আলোক এসে পৌঁছয়
ভুলে যাওয়া প্রতিটা নিঃস্ব মানুষের ঘরে ঘরে,
তোমাদের তীক্ষ্ণ নক্ষত্র
মৃত্যুতে হারিয়ে ফেলে তাদের যত উগ্র রশ্মিরেখা
তারপর আবার গড়ে তোলে আশার যত নতুন আঁখিপল্লব।

ওয়ালজ্‌

ঘৃণাকে আমি আবৃত স্তনের মতো স্পর্শ করি :
কোথাও না থেমেই এক পোশাক থেকে আর এক পোশাকে যাই,
ঘুমোই কোনো দূর দূরান্তে।

না, আদপে আমি কোনো কাজের নই, চিনি না
কাউকেই : সমুদ্র বা অরণ্যের কোনো অস্ত্রই নেই আমার কাছে,
আমি বাস করি না এই বাড়িতে।

আমার মুখ ভর্তি জল আর রাতের অন্ধকার।
অপেক্ষমান চাঁদ খুব ভালো করেই জানে
আমার কি কি নেই।

ভরা-জোয়ার বলতে কিছু নেই, না বর্ম, না সাঁতার-পোশাক,
না প্রতিধ্বনিত হবার মতো গভীর কোনো সমাধান,
না উৎশৃঙ্খল কোনো চোখের পাতা।

হঠাৎ করেই আমি কেবল বাঁচি, বাকি সারাক্ষণ অনুসরণ করি।
হঠাৎ করেই আমি স্পর্শ করি কোনো মুখ, সে আমাকে হত্যা করে।
আসলে আমার কোথাও কোনো সময় নেই।

মিছিমিছি আমাকে না খুঁজে
বরং টেনে তোলো স্বাভাবিক যে বুনো তন্তু
কিংবা রক্তাক্ত জাল।

আমাকে ডেকো না : ওইটেই আমার পেশা।
জিগেস কোরো না আমার নাম কিংবা শারীরিক সুস্থতা।
আমাকে একা থাকতে দাও আমার নিজের চাঁদের কেন্দ্রবিন্দুতে
আমার আহত ভূমির মর্মস্থলে।

ব্রুসেল্‌স্‌

যাকিছু আমি করেছি, যাকিছু আমি হারিয়েছি,
যাকিছু আমি অপ্রত্যাশিতভাবে জয় করেছি
কঠিন ইস্পাতে, তিক্ত পত্রগুচ্ছে,
তা থেকে আমি খুব সামান্যই স্বেচ্ছায় দিয়ে যেতে পারি :

আতঙ্কিত ভয়ের একটা স্বাদ,
জ্বলন্ত ঈগলের পালকে ঢেকে যাওয়া একটা নদী,
পাপড়িতে পাপড়িতে গন্ধকের উৎসধারা।

এখনও কেউই আমাকে অব্যাহতি দেয়নি—
না পবিত্র লবণ, না প্রাত্যহিক রুটি, না সামুদ্রিক বর্ষণে স্নাত
খুদে গির্জা, না উড়ন্ত ফেনায় ভেজা
আধপোড়া কয়লা।

অনেক খোঁজাখুঁজি করে তবে পেয়েছি
অন্ধকার মাটির নিচে, ভয়ংকর দেহগুলোর মাঝে,
কঠিন অম্লের নিচে দিয়ে যাওয়া আসা করা
ফ্যাকাশে কাঠের একটা দাঁতের মতো
মৃত্যুর সাজসরঞ্জাম,
ছুরি আর আয়নার মাঝে রাত্রির মুমূর্ষতা।

এখন, এই
বেপরোয়া গতির মাঝখানে, তারহীন
দেওয়ালের পাশে,
সীমানা দিয়ে ঘেরা অতল গহনে,
জাহাজডুবি নক্ষত্রপুঞ্জদের সঙ্গে নিয়ে আমি এখানে দাঁড়িয়ে রয়েছি,
উদ্ভিদের মতো সম্পূর্ণ একা।

নতুন নিশানে পুনর্মিলন

কে বলেছে এমন মিথ্যে ? পদ্মের পা
ভাঙা, খেঁ পাওয়া যায় না, অতল গহন অন্ধকার,
সবকিছুই ক্ষতবিক্ষত আর গাঢ় দীপ্তিতে মোড়া !
সবকিছুই ঢেউয়ের ছাঁদে ঢেউয়ে ঢেউয়ে বাঁধা,
অম্বরের অনির্দিষ্ট সমাধি
আর ফোঁটায় ফোঁটায় অমসৃণ শস্যকণা !
এরই মাঝে আমি বুক পেতে শুনেছি
লবণের ভয়ংকর কণ্ঠস্বর,
রাত্তিরে শেকড় গাড়তে বেরিয়েছি।
আমি অনুসন্ধান করেছি মাটির তিক্ততা,
আমার কাছে সবই হয় রাত্রি না হয় বিদ্যুতের তীব্র ঝলক :
আমার মাথায় ঠাসা অদৃশ্য মোম
আর আমার পায়ের চিহ্নে এলোমেলো ছড়ানো ভস্মরাশি।

এবং এ যদি মৃত্যু না-ই হয়
তাহলে কার জন্যে আমি খুঁজেছি এই হিমেল প্রাণের স্পন্দন ?
কেউ যদি না-ই শোনে
তাহলে কার জন্যে আমি এই নির্জন অন্ধকারে হারিয়েছি অন্ধ গীটার ?
না,
এবার সময় হলো, পালাও
রক্তের ছায়ারা পালাও,
নক্ষত্রের তুষার, ধাবমান মানুষের পদসঞ্চারে তোমরা পিছু হটো,
আমার পায়ের তলা থেকে সরিয়ে নাও কালো ছায়া !

আহত হাত সেইসব মানুষদের মধ্যে আমিও একজন
তুলে ধরেছি একই আরক্ত পেয়ালা
একই সমান ক্ষুব্ধ বিস্ময় :
একদিন

মানবিক স্বপ্নে প্রজ্বলিত এক
বুনো ঘোড়া
টগবগিয়ে এলো আমার সর্বগ্রাসী রাতে
যাতে আমার নেকড়ের পদচারণা
মেলাতে পারি মানুষের পায়ে পায়ে।
এবং এমনিভাবে, সম্মিলিত
একই অবিচল কেন্দ্রে, আমি আর খুঁজি না আশ্রয়
কান্নার গহ্বরে : দেখাই মৌমাছিদের সঞ্চয়,
মানুষের সন্তানসন্ততির জন্যে উজ্জ্বল রুটি :
রক্ত থেকে দূরে গমের বিস্তীর্ণ প্রান্তরে দেখবে বলে
অগাধ রহস্যে শ্যামলিমা প্রস্তুত নিজেই।

কোথায় তোমার গোলাপের আসন পাতা ?
কোথায় তোমার নক্ষত্রের আঁখিপল্লব ?
তুমি কি ভুলে গেছো ঘামে ভেজা সেইসব আঙুল
বালিতে পৌঁছবে বলে যারা পাগল ?
তোমার জন্যে শান্তি, হে বিষাদ সূর্য,
তোমার জন্যে শান্তি, হে অন্ধ কপাল,
তোমার জন্যে পথের ওপর গনগনে জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ড,
যেখানে রহস্যহীন পাথরগুলো অপলক চোখে তোমাকে লক্ষ্য রাখে
যেখানে কারাগারের উন্মত্ত নগ্ন নক্ষত্রখচিত নৈঃশব্দ্য এক মগ্ন নরক।
কান্নার প্রতিরোধে সবাই সম্মিলিত !
মাটি আর স্নিগ্ধ গন্ধের
এ এক চরম মুহূর্ত, ভয়ঙ্কর লবণরাশি থেকে সদ্যউত্থিত
মুখটার দিকে তাকিয়ে দেখ,
তাকিয়ে দেখ এই তিক্ত মুখ যা হাসিতে উচ্ছল,
তাকিয়ে দেখ এই নতুন হৃদয় যা তোমাকে অভিনন্দন জানায়
সংকল্পে দৃঢ়, স্বনীল, প্লাবিত পুষ্পগুচ্ছে।

স্তালিনগ্রাদ

রাতের বেলায় ঘুমন্ত কৃষাণ হঠাৎ ঘুম ভেঙে জেগে ওঠে,
অন্ধকারের বুকে হাঁতড়ে জিগেস করে : নিশান্তিকা,
ভোরের সূর্য, হে আগামী দিনের আলোক, আমাকে বলো
মানুষের পবিত্র হাত কি এখনও রক্ষা করছে সম্মানের দুর্গ ?
বলো, হে নিশান্তিকা, তোমার ভ্রূর ইস্পাত এখনও কি তেমনই মজবুত,
এখনও কি মানুষ আগেরই মতো হুঁশিয়ার, আর বজ্র তার জায়গায় ?
বলো, রাত্রির বিস্তীর্ণতায় এখনও কি পৃথিবী কান পেতে শুনছে
মাটিতে টুপটাপ ঝরে পড়া বীরের রক্তের শব্দ ?
বলো, এখনও কি আকাশ গাছেদের মাথার ওপরে দাঁড়িয়ে
এখনও কি স্তালিনগ্রাদে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে গোলাবারুদের শব্দ ?

মাঝরাতে ভয়ংকর বিক্ষুব্ধ সমুদ্রে ঘুম ভেঙে নাবিক
জলে ভেজা অস্পষ্ট নক্ষত্রপুঞ্জের মাঝে খোঁজে
জ্বলন্ত শহরের লাল টকটকে একটা তারা,
নিজের বুকের মধ্যে প্রজ্বল তারাটাকে সে খুঁজেও পায়,
দুর্লভ সেই তারাটাকে স্পর্শ করার জন্যে তার দশ আঙুল পাগল হয়ে ওঠে,
তখন দ্যাখে নিজের দু চোখে জলে ভিজে তারাটা জ্বলজ্বল করছে।

লাল নক্ষত্র, শহর, বন্ধ করো তোমার অপ্রত্যাশিত আঘাত,
তোমার কঠিন দরজা, তোমার সম্মানের রক্তাক্ত লরেলের মুকুট,
অস্ত্রশস্ত্র সুসজ্জিত গ্রহটার ওপারে তোমার চোখের
গাঢ় উজ্জ্বলতায় কাঁপতে থাকুক ভীরু রাত্রি।
আর স্পেনের মানুষ মাদ্রিদের কথা স্মরণ রেখে বলে : বোনেরা,
রক্ষা করো তোমাদের সম্মান, সারা স্পেন জুড়ে
ঝরানো প্রতিটা রক্তবিন্দু আবার মাথা তুলে দাঁড়াবে,
ফায়ারিং-স্কোয়াডের দেওয়াল ঘিরে দাঁড়ানো স্পেনের মানুষ জিগেস করে :
স্তালিনগ্রাদ এখনও টিঁকে আছে তো ?
আর কারাগারে সারিসারি কালো চোখের শৃঙ্খল

তোমার নামে কাঁপিয়ে তোলে উত্তুঙ্গ প্রাচীর,
তোমার মৃতের সংখ্যা, তোমার রক্তপাতে স্পেন কেঁপে ওঠে, স্তালিনগ্রাদ,
কেননা তুমি তাকে নিবিড় করে আঁকড়ে ধরেছো বুকের মধ্যে
আর স্পেন তোমারই মতো জন্ম দিয়ে চলেছে যত বীরের দল।

সেদিন সেও এমনি নিঃসঙ্গ একা দাঁড়িয়ে ছিলো, স্পেন,
যেমন আজ তুমি একা দাঁড়িয়ে রয়েছো, স্তালিনগ্রাদ।
সেদিনও দুঃসহ যন্ত্রণায় স্পেন যখন নখে নখে মাটি আঁচড়াচ্ছিলো
আগের চেয়েও রূপসী প্যারিস তখন হাসছিলো,
সেদিনও যখন মহীরুহের মতো স্পেনের বিশাল শরীর থেকে রক্তের বন্যা বয়ে যাচ্ছিলো
পেড্রো গাফিয়াসের ভাষায় লণ্ডন তখন তার সবুজ ঘাসের বাগানে
মন্থর পায়ে হাঁটছিলো আর হ্রদের জলে পরিচর্যা করছিলো রাজহাঁসদের।

রাশিয়া, আজ তুমি জানো কনকনে শীত আর নিঃসঙ্গতা কাকে বলে।
হাজার হাজার কামানের গোলায় যখন ছিঁড়ে যাচ্ছে তোমার বুক,
যখন হিংস্র প্রতিহিংসার বিষাক্ত কাঁকড়াবিছে হুল বাগিয়ে
ধেয়ে আসছে তোমার দিকে, স্তালিনগ্রাদ,
নিউ ইয়র্ক তখন স্ফূর্তিতে নাচছে, লন্ডন ঝিম মেরে আছে,
আর আমি বলি, এ দুঃসহ,
কেননা আমি আর সহ্য করতে পারি না
আমরা আর সহ্য করতে পারি না এ পৃথিবীকে
যেখানে বীরেরা নিঃসঙ্গ একা একা মারা যায়।

তুমি কি চাও ওরা এমন নিঃসঙ্গই থেকে যাক ?
তুমি কি চাও না ওরা তোমার পাশে এসে দাঁড়াক !
তুমি কি চাও ওরা চিরদিনই এমন নিঃসঙ্গ থাকবে ?
তুমি কি চাও
কেবল কবরে পড়ে পচার জন্যেই জীবন,
আর ক্লেদাক্ত গ্লানিমায় মানুষের মুখ থেকে মুছে যাবে হাসি ?

জবাব দিচ্ছো না কেন স্তালিনগ্রাদ ?

তুমি কি চাও

পূর্ব সীমান্তের আরও মৃতদেহে ভরে যাক তোমার সারাটা আকাশ ?
কিন্তু তখন নরক ছাড়া তোমার নিজের বলতে আর কিছুই থাকবে না।
ওদের বীরত্বের কাহিনী শুনতে শুনতে দুনিয়ার কান পচে গেছে,
আজ আর কেউ শুনতে চায় না
মাদাগাস্কারে বীর সেনাপতিরা কেমন করে পঞ্চান্নটা বাঁদরকে হত্যা করেছে,
কেমন করে শরৎকালীন অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেছিলো মেয়েদের একটা ছাতা ॥

স্তালিনগ্রাদ, আমরা কোনোদিনই স্পর্শ করতে পারবো না
তোমার উত্তুঙ্গ প্রাচীর, আমরা যে অনেক অনেক দূরে থাকি।
আমরা মেক্সিকোর লোক, আরাউকানিয়ান আমরা,
আমরা পাটাগোনিয়ান, গাউরনি আমরা,
আমরা উরুগুয়ে, চিলির লক্ষ কোটি মানুষ।
যদিও তোমার সঙ্গে আত্মীয়তা আজ আমাদের সুনিবিড়
তবু তোমাকে রক্ষা করার জন্যে যেতে পারছি না, মা আমার।
জ্বলন্ত শহর, স্তালিনগ্রাদ, ততদিন তুমি বুকে বুক দিয়ে যুঝে থাকো
যতদিন না আমরা, জাহাজডুবি-ঝড়ে বিধ্বস্ত কৃষ্ণাঙ্গরা,
মায়ের কাছ থেকে পাওয়া চুম্বনের মতো যারা সেখানে পৌঁছবার স্বপ্ন দেখেছিলো,
তারা স্পর্শ করতে পারছে তোমার উত্তুঙ্গ প্রাচীর।

স্তালিনগ্রাদ, এখনও কোথাও কোনো দ্বিতীয় রণাঙ্গন খোলা হয়নি,
এখনও আগুনের গোলা আর বুলেট দিন রাত ছিন্নভিন্ন করে যাচ্ছে তোমার বুক,
তবু তুমি মুখ থুবড়ে পোড়ো না মাটিতে।

যদি তোমার মৃত্যুও হয় তবু তুমি মোরো না স্তালিনগ্রাদ !

কেননা মানুষ কোনোদিনই মরতে পারে না,
পতনেও তাকে সংগ্রাম করে যেতে হবে
যতক্ষণ না বিজয় নিজে এসে ধরা দেয় তোমার হাতের মুঠোয়,

যদিও তা ক্লান্ত, ক্ষতবিক্ষত, মৃত,
তবু অন্য রক্তাক্ত হাত সারা পৃথিবীর প্রতিটা প্রান্ত জুড়ে
দেখাবে তোমার বীরদের মৃতদেহ
যাতে অঙ্কুরে অঙ্কুরে ভরে ওঠে তামাম এ পৃথিবী।

বলিভারের গান

আমাদের পিতা যিনি আছেন জলে স্থলে অন্তরীক্ষে
আমাদের এই নিস্তব্ধ অক্ষরেখার বিশাল ব্যাপ্তিতে,
এ তল্লাটের সবকিছুই বহন করে তোমার নাম, হে পিতা :
তোমারই নামে আখের স্বাদ হয়ে ওঠে আরও মধুর,
বলিভার-টিনে ঝলসায় বলিভারের উজ্জ্বল দীপ্তি,
বলিভার-পাখি ওড়ে বলিভারের আগ্নেয়গিরির চূড়ায়,
আলু, শোরা, অনন্য ছায়া,
নানান স্রোত আর ফসফরাস-উপলের গ্রন্থি,
আমাদের বলতে যাকিছু সবই উদ্ভূত তোমার নির্বাপিত জীবন থেকে,
আমাদের যত নদীমালা, শ্যামলী প্রান্তর, কিংবা গির্জার উত্তুঙ্গ ঘণ্টাঘর
সবেতেই তোমার সমান উত্তরাধিকার, হে পিতা,
এমন কি আমাদের নিত্য উপার্জিত যে রুটি সে তো তোমারই দেওয়া।

তোমার দুঃসাহসী সেনানায়কের ছোটখাটো মৃতদেহটা
তার ধাতব অবয়বকে ছড়িয়ে দিয়েছে বিপুল ব্যাপ্তিতে,
সহসা তুষার থেকে জেগে ওঠে তোমার আঙুলের বিন্যাস
আর দক্ষিণের জেলেরা হঠাৎ আলোতে তুলে ধরে
তোমার স্বচ্ছ হাসি, জালে জালে স্পন্দিত হয়ে ওঠে তোমার কণ্ঠস্বর।
তোমার হৃদয়ের পাশে যে গোলাপ ফোটাবো কি হবে তার রঙ ?
সে গোলাপ হবে টুকটুকে লাল যে স্মরণ করিয়ে দেবে তোমার পদপাত।
কেমন হবে সেই হাত যা স্পর্শ করবে তোমার পবিত্র ভস্মরাশি ?

তোমার ভস্ম থেকে যাদের জন্ম সে হাত হবে টুকটুকে লাল।
আর কেমন দেখতে হবে তোমার মৃত হৃদয়ের বীজ?
সে বীজ হবে লাল টুকটুকে ঠিক তোমার স্পন্দিত হৃদয়ের মতো।

তাই আজ তোমাকে ঘিরে রয়েছে হাতে হাত দিয়ে গাঁথা বিরাট একটা বৃত্ত।
আমার ঠিক হাতের পরেই আর একটা হাত, তারপর আর একটা,
তারপর আরও অজস্র, অন্ধকারাচ্ছন্ন মহাদেশের গভীর অন্তস্তল পর্যন্ত বিস্তৃত।
এছাড়াও, বলিভার, তোমার অজানিতে আরও অগণন হাত
এগিয়ে আসছে তোমার হাতে হাত মেলাতে—
তেরুয়েল থেকে, মাদ্রিদ থেকে, জারামা থেকে, এব্রো থেকে,
বন্দীশালা, বাতাস আর স্পেনে নিহত মানুষের কাছ থেকে
এগিয়ে আসছে সেই লাল হাত তোমারই আত্মা থেকে যার জন্ম।

সেনাধ্যক্ষ, সৈনিক, কোনো কণ্ঠে যেখানেই উচ্চারিত হয়েছে
স্বাধীনতা, যেখানেই পৌঁচেছে সে ডাক,
যেখানেই লালমুখো সৈনিক গুঁড়িয়ে দিয়েছে কৃষ্ণাঙ্গের মাথা,
যেখানেই ফুটে উঠেছে স্বাধীনতার আরক্ত একটা গোলাপ,
যেখানেই নতুন কোনো নিশান আমাদের প্রদীপ্ত ভোরের রক্তে রাঙা হয়ে উঠেছে,
বলিভার, সেনাধ্যক্ষ, সেখানেই ফুটে উঠেছে তোমার মুখ।
ধোঁয়া আর বারুদে আবার জন্ম নেয় তোমার তরবারি।
রক্তের কারুকার্যে আবার রঞ্জিত হয়ে ওঠে তোমার নিশান।
দুশমনরা আবার ঝাঁপিয়ে পড়ে তোমাব অঙ্কুরকে অধিকার করবে বলে,
মানবশিশুকে আবার বিন্ধ করবে বলে সাজায় অন্য ক্রুশ।

তবু তোমার ছায়া আমাদের আশার দিকে নিয়ে যায়,
তোমার লালফৌজের বরমাল্য আর দ্যুতিময় আভা
আমেরিকার রাত্রির ওপার থেকেও তাকিয়ে থাকে তোমার দিকে।
তোমার চোখ সমুদ্রের তরঙ্গ ছাপিয়ে, অগ্নিদগ্ধ অন্ধকার শহর পেরিয়ে
দূর দূরান্তের নির্যাতিত-আহত মানুষদের প্রতি দৃষ্টি রাখে,
আবার নতুন করে জন্ম নেয় তোমার কণ্ঠস্বর, তোমার বলিষ্ঠ বাহু:

তোমার মুক্তিফৌজ রক্ষা করে পবিত্র নিশান :
ভয়ংকর দুঃখের শব্দ ছাপিয়েও বেজে ওঠে তোমার ঘণ্টাধ্বনি
ধীরে ধীরে ফুটে ওঠে মানুষের রক্তে রাঙানো এক নিশান্তিকা।

হে মুক্তিদাতা, তোমার বাহুবন্ধনে জন্ম নিয়েছে এক শান্তির জগৎ।
শান্তি, রুটি আর গম জন্ম নিয়েছিলো তোমারই রক্তে,
তোমারই রক্তে জন্ম নেওয়া আমাদের তাজা রক্তের মধ্যে দিয়ে আসবে
আমরা যে নতুন বিশ্ব গড়তে যাচ্ছি তার জন্যে শান্তি, রুটি আর গম।
আশ্চর্য সুন্দর দীর্ঘ এক প্রভাতবেলায়, মাদ্রিদে,
পঞ্চম সেনাবাহিনীর পুরোভাগে তোমার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিলো, বলিভার।
আমি জিগেস করেছিলুম, পিতা, তুমি আছো, না নেই, কে তুমি ?
পাহাড়ি সেনা-ছাউনির দিকে চোখ রেখে তুমি বলেছিলে :
একশো বছরে একবার আমি জেগে উঠি যখন জনগণের ঘুম ভাঙে।

মাকচু পিকচুর নগর শীর্ষে

এক

বাতাস থেকে বাতাসে শূন্য জালের মতো
আমি যাই পথে পথে, পারিপার্শ্বিক আবহাওয়ায়,
সচ্ছল সমৃদ্ধ পাতা
শরতের নিঃশব্দ যাওয়া আসায়,
বসন্ত আর গুচ্ছগুচ্ছ নমিত ফসলের মাঝে,
যেখানে অনন্য ভালোবাসা
আমাদের হাতে তুলে দেয় দীঘল চাঁদের রেখা।

(মহফিলের ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ আবহাওয়ায়
উজ্জ্বল দিনগুলো আমি কাটিয়েছি স্বাচ্ছন্দ্যে :
ইস্পাত রূপান্তরিত

'অম্লতার নিপুণ নৈঃশব্দ্যে :
রাত্রিরা উন্মোচিত তাদের শেষ শস্যকণায় :
পরিণীত স্বদেশভূমির আহত পরাগকেশরেরা নিশ্চল।)

কেউ একজন বেহালার সুরে যে আমাকে ধরে রাখে
উদ্ভাসিত করে তোলে একটি জগৎ
বিলুপ্ত চূড়ার মতো
ঘোরানো সিঁড়িগুলো যার
গন্ধক-বর্ণ রুক্ষ পাতার নিচে সম্পূর্ণ ঢাকা :
এবং ভূতত্ত্বের সোনায় এখনো মগ্ন গভীর,
যেন উল্কায় জড়ানো কোনো তরবারি,
কোমল দুর্বিনীত হাত আমার ডুবিয়ে দিলাম
মাটির সবচেয়ে গভীরতম উর্বরতায়।
গহন স্রোতে রাখলাম আমার কপাল,
গন্ধকজাত শান্তির অতলে আমি বুদবুদের মতো মিলিয়ে গেলাম,
এবং যেন কোনো অন্ধ মানুষ
আমি ফিরে এলাম
জীর্ণ রিক্ত মানবিক বসন্তের সেই চামেলির কাছে।

দুই

ফুলে ফুলে সমর্পিত অন্তিম অঙ্কুর
আর পাহাড়,
মুক্তো আর বালির বিক্ষত বিবর্ণ পোশাকে
সঞ্চয় করে রাখে তাদের ছিন্ন ফুলদল,
মানুষ
অশান্ত ঊর্মিল সমুদ্র-প্রবাহ থেকে সংগৃহীত
আলোকের পাপড়িটুকে সযত্নে গুটিয়ে রাখে,
স্পন্দিত ধাতুপিণ্ড ঢালাই করে রাখে তার স্তব্ধ করপুটে
তারপর তামাক আর পোশাকের মাঝে
মগ্ন টেবিলে, ছড়ানো তাসের মতো

পড়ে থাকে হৃদয়ঃ
সতর্ক স্ফটিক, সমুদ্রে অশ্রুরাশি যেন
তুষার পল্বল : তবু
সংবাদ আর ঘৃণায় নিহত নির্যাতিত সে,
রুদ্ধশ্বাস
দিনের নগ্ন গালিচায়
বিদীর্ণ তার পোশাকের বৈরী-কাঁটাতারের বেড়ায়

না বারান্দায়, না বাতাসে
সমুদ্র কিংবা রাস্তায় (আরক্ত গাঢ় পাপির মতো)
ছুরিবিহীন কে সতর্ক পাহারা দেয় তার রক্ত ?
ক্রোধোন্মত্ততায় সঙ্কুচিত দাস-ব্যবসায়ীর বিষন্ন বাণিজ্যিকতা,
আর পামের উত্তুঙ্গ চূড়ায় শিশির
হাজার বছর ধরে রেখে গেছে তার স্বচ্ছ সংবাদ
একই প্রতীক্ষিত শাখায়, আঃ হৃদয়,
শরতের অন্ধকার গুহাকন্দরে হে অভিশপ্ত কপাল !

কতবার শহরের হিমেল রাস্তায়
কিংবা যাত্রিবাহী বাসে
কিংবা উৎসবের রাতে, নির্জনতার গহন গভীরে
ছায়া আর ঘণ্টাধ্বনির নিচে
মানবিক উচ্ছলতার সেই বিশেষ অন্ধকার গহ্বরে
আমি থামতে চেয়েছি
খুঁজতে চেয়েছি অন্তহীন চিরকালীন প্রবণতা
একদিন যা এর আগেই আমি স্পর্শ করেছিলাম পাথরে,
কিংবা চুম্বনে স্খলিত বিদ্যুদ্‌লেখায় ।
(এ যেন শস্যকণায় নিটোল অঙ্কুরিত স্তনের
পীতাভ কাহিনী, উন্মেষণের স্তরবৃন্তে তার
কোমল ভালোবাসার
সেই একই পুনরাবৃত্তি,

যা চিরদিন চিরদিনই অতিক্রম করে যায় শুভ্র মর্মর
আর যা সমুদ্রে স্বচ্ছ
স্বদেশভূমি,
নিঃসঙ্গ সুদূরে তুষার থেকে
রক্তাক্ত ঢেউয়ের দিকে ভেসে আসা তার ঘণ্টাধ্বনি।)

আমি যা ছিনিয়ে নিতে পারি
কেবল একগুচ্ছ মুখ আর স্খলিত মুখোশ,
সোনার শূন্য বলয়ের মতো
পরিত্যক্ত ছড়ানো পোশাকের মতো,
আর ক্ষিপ্ত আদিম শরতের সেইসব শিশু
যারা কাঁপায় শঙ্কাতুর উপজাতির তুচ্ছ গাছটাকেও।

উন্মুক্ত প্রসারিত হাতের উষ্ণ কিংবা হিমেল শীতলতা ফিরে পাবার জন্যে
আমি কোথাও খুঁজে পাই না আমার হাত রাখার এতটুকু জায়গা,
এমন কোনো জায়গা
যা অবরুদ্ধ ঝরনার জলস্রোতের মতো তীব্র প্রবাহিত
কিংবা দগ্ধ কয়লা আর স্ফটিকপিণ্ডের মতো কঠিন।
কোন সে মানুষ ?
শিস দেওয়া আর দোকানে যাওয়ার ফাঁকে ফাঁকে
তার প্রাণখোলা আলাপনের কোনো অংশে
কোন সে ধাতব পদসঞ্চারে
চিরদিন বেঁচে থাকে তার অক্ষয় অবিলোপী জীবন ?

তিন

জীবন যেন ফসলের চ্যুত মঞ্জরী,
বিলুপ্ত কাহিনী আঁর এক থেকে সাত আট,
অজস্র করুণ ঘটনার অন্তহীন যাঁতাকলে
বিচূর্ণ,
কেবল একটাই নয়, অসংখ্য মৃত্যু আসে প্রত্যেকেরই কাছে :

প্রতিদিনই এক একটা ছোট ছোট মৃত্যু, তুচ্ছ পতঙ্গ আর ধূলিকণা,
উপকণ্ঠের ক্লেদাক্ত ম্লানিমায় নির্বাপিত প্রদীপ
আর বিস্তীর্ণ-পাখার ছোট্ট একটা মৃত্যু
প্রবেশ করে প্রতিটি মানুষের বুকে তীক্ষ্ণ-ফলা ছোট্ট বল্লমের মতো
হয় রুটি
না হয় ছুরিতে আহত
বিধ্বস্ত মানুষ, মেষপালক, সমুদ্র-বন্দরের শিশু,
লাঙলের কৃষ্ণাঙ্গ অধিনায়ক কিংবা জনাকীর্ণ রাস্তার খেঁকি কুকুর,
সবাই মৃত্যুর প্রতীক্ষায়, তাদের
সংক্ষিপ্ত প্রাত্যহিক মৃত্যুর প্রতীক্ষায় বিবর্ণ পাংশুল
এবং দিনের পর দিন তাদেব বিষণ্ণ ক্ষয়িষ্ণুতা
যেন রাত্রির মতো গাঢ় কোনো পানপাত্র
যা থেকে উদ্বিগ্ন তারা কাঁপা কাঁপা হাতে পান করে ফেনিল মৃত্যু।

চাব

অমিত মৃত্যু আমাকে বহুবার হাতছানি দিযে ডেকে গেছে
এ যেন ঊর্মিমালার অদৃশ্য লবণকণা,
অর্ধেক জলের নিচে অর্ধেক পাহাড়ি চূড়া থেকে
ছড়িয়ে পড়ে তার অদৃশ্য গন্ধের উচ্ছ্বাস
কিংবা বাতাস আর হিমবাহের বিশাল স্থপতি।

আমি এসে পৌঁছই লৌহময় প্রান্তবে
বাতাসের সংকীর্ণ গলিতে
পাথর আর চাষবাসের শবাচ্ছাদনে,
অন্তিম পদপাতের নাক্ষত্রিক নির্জনতায়
আর উত্তুঙ্গ শৃঙ্খল পাহাড়ি পথে
অথচ বিস্তীর্ণ সমুদ্র, হে মৃত্যু!
ঢেউয়ে ঢেউয়ে তুমি কোনোদিনই আসোনি
এসেছো অতর্কিতে নৈশকালীন স্বচ্ছতায়
রাত্রির সমগ্র সত্তার মতো।

তুমি কোনোদিন আসোনি আমাদের পকেট হাতড়াতে,
তোমার পক্ষে কোনোদিনই ঘুরে বেড়ানো সম্ভব ছিলো না উজ্জ্বল লাল পোশাক
ছাড়া :
আবৃত নৈঃশব্দ্যের মেরুপ্রান্তিক গালচে ছাড়া :
অশ্রুর উত্তুঙ্গ অথবা মগ্ন উত্তরাধিকার ছাড়া।

আমি ভালোবাসতে পারি না সব ধরনের গাছ
যারা তাদের কাঁধে বয়ে নিয়ে বেড়ায় ক্ষণিক শরৎ
(হাজারো পাতার মৃত্যু)
মাটিবিহীন, অতল জলরাশিবিহীন
এ সবই অলীক মৃত্যু আর পুনরুত্থান :
বিস্তীর্ণ নদীতে, স্বচ্ছ প্রবাহিত নদীর উৎসধারায়
আমি সাঁতার দিতে চেয়েছিলাম,
অথচ একটু একটু করে মানুষ যখন আমাকে অস্বীকার করলো
বন্ধ করলো দরজা জানলা
যাতে আমার বহমান হাত
স্পর্শ করতে না পারে ওদের আহত অস্তিত্ব,
তখন থেকেই আমি চলে গেলাম পথে পথে নদীতে নদীতে
শহর থেকে শহরে, শয্যা থেকে শয্যায়,
আর আমার লবণাক্ত মুখোশ অতিক্রম করে গেলো বিশাল মরুর নির্জনতা,
এবং শেষ পরিত্যক্ত বাড়িগুলোতে
আলোবিহীন, আগুনবিহীন, রুটিবিহীন
পাথর আর নির্জনতাবিহীন
আমার নিজেরই মৃত্যুর মুমূর্ষুতায় আমি গড়িয়ে গেলাম।

পাঁচ

বিষণ্ন মৃত্যু, তুমি নও লৌহকঠিন পালকের পাখি
যাদের জন্যে এইসব আবাসভূমির রিক্ত উত্তরাধিকার—
ত্রস্ত লোলুপ
শূন্য চামড়ার নিচে যা সে বহন করে নিয়ে চলে তার আপন সত্তায়

এ অন্যকিছু
বিলীয়মান কাণ্ডের ছিন্ন ফুলদল,
তার বুকের অতি সূক্ষ্ম সংগ্রামের সঙ্গে যার কোনো সম্পর্ক নেই
অথবা তিক্ত শিশির যা স্পর্শ করে তার শুভ্র কপাল।
এ যেন সেই যা আর কখনো জন্মাতে পারে না
শান্তি কিংবা সাম্রাজ্যবিহীন সেই ছোট্ট মৃত্যুর কোনো ভগ্নাংশ :
তার আপন সত্তায় মৃত্যুলীন কোনো অস্থি, একটা ঘণ্টাধ্বনি।
আমি মুছে ফেললাম আয়োডিনের প্রলেপ
হাতদুটো আমার ডুবিয়ে দিলাম রিক্ত যন্ত্রণায়
যা হনন করে চলে মৃত্যুকে
আর কিছুই খুঁজে পায় না তার গভীর ক্ষতে
কেবল আত্মার অস্পষ্ট ফাটলের মধ্যে দিয়ে বহে যাওয়া
এক ঝলক হিমেল বাতাস।

ছয়

তারপর হারানো অরণ্যে আদিম বর্বরতার মধ্যে দিয়ে
পৃথিবীর সিঁড়ি বেয়ে আমি ওপরে উঠে যাই
তোমার কাছে,মাকচু পিকচু।

খাড়াই পাহাড়ের বিশাল শহর
অন্তিম আবাসভূমি,
যা পৃথিবী লুকিয়ে রাখতে পারেনি তার রাত্রির পোশাকে।
তোমার মধ্যে সমান্তরাল দুটো রেখার মতো বিদ্যুতের দোলনা
আর মানুষ
দুলে ওঠে তীক্ষ্ণমুখ কাঁটার হাওয়ায়।

পাথরের মা আমার, শকুনের বিশাল ফেনা।

মানবিক নিশান্তিকার উত্তুঙ্গ প্রবাল প্রাচীর।

আদিম বালিতে হারানো বেলচা।

এই অঞ্চল, এই সে আবাসভূমি :
এখানে ভরন্ত শস্যকণারা মাথা তোলে
আবার ঝরে পড়ে আরক্ত শিলাবৃষ্টির মতো।

এখানে ভিকুনা ঝরায় সোনালী পশম
তাতে বোনা হবে শবাচ্ছাদন
প্রেমিক, মাতা, সম্রাট, যাজক আর বিজয়ীর ঝলমলে পোশাক।

এখানে রাত্রে মানুষ
পা রাখে তীক্ষ্ণনখ ঈগলের পায়ের পাশে
তাদের উত্তুঙ্গ রক্তলোলুপ মাংসাশী নীড়ে,
আর নিশান্তিকায় বজ্রের পায়ে পদদলিত ভঙ্গুর কুয়াশা
স্পর্শ করে পৃথিবী পাথর
যতক্ষণ না তারা চিনতে পারে তাদের রাত্রি অথবা মৃত্যুকে।

আমি তাকিয়ে থাকি জামাকাপড় আর হাতের দিকে
প্রতিধ্বনিত গহ্বরে জলের উৎসের দিকে
আমার দৃষ্টিমেশা পার্থিব প্রদীপের দিকে তাকিয়ে থাকা
একটি মুখের স্পর্শে মসৃণ দেওয়ালের দিকে
যে প্রদীপে তেল ঢেলেছি উধাও অরণ্য আমার নিজের হাতে :
কেননা সবকিছুই
পিরান, পশুর লোমের পোশাক, পেয়ালা, শব্দ, মদ, রুটি
সব সবই ভূলুণ্ঠিত পথের ধুলায়।

আর বাতাস
কমলা ফুলের দীঘল আঙুলে
প্রবাহিত হয়ে গেলো নিদ্রালস প্রতিটা মানুষের ওপর দিয়ে :
বাতাসের হাজারটা বছর, মাস, সপ্তাহ,

বাতাস

সবুজ হাওয়ার, রুক্ষ পর্বতমালার,
পদসঞ্চারে পাথরের নির্জন সাম্রাজ্যকে ঘষে মেজে মসৃণ করে
বিনম্র ঘূর্ণিঝড়ের মতো বয়ে গেলো যে বাতাস।

সাত

অতল একটি গহ্বরে প্রাচীন মৃত্যু
গভীর একটি গিরিখাদের নিস্তব্ধ কয়েকটি ছায়া.
এমনিভাবে এই গহন গভীরতা থেকে
পাওয়া গেলো তোমার প্রকৃত আয়তনের পরিধি ·
যখন মৃত্যু এলো, সম্পূর্ণ ঝলসানো মৃত্যু
বিদীর্ণ পাহাড় থেকে
আরক্ত উজ্জ্বল রাজধানী থেকে
একক এক মৃত্যুতে তুমি শরতের মতো কেঁপে উঠলে।
আজ আর শোক করে না রিক্ত বাতাস
জানে না তোমার কাদামাটির পা
ভুলে গেছে তোমার জলের পাত্র যা পরিশ্রুত করতো
বিদ্যুতের তীক্ষ্ম ছুরিতে বিদীর্ণ করা আকাশ
যখন ঝড়ে ওপড়ানো বিশাল মহীরুহও
সম্পূর্ণ ঢেকে যেতো কুয়াশায়।

উত্থিত একটি হাত যেন সহসা ওপর থেকে খসে পড়লো
সময়ের অতলান্তে।
তুমি আর রইলে না, ঊর্ধবাহু, অপলকা তন্তুরাজি, গ্রন্থিল বুনট-
তোমার যা কিছু ছিলো
সবই নিশ্চিহ্ন : লোকাচার, ছিন্ন-অক্ষরমালা
প্রজ্জ্বলিত আলোর মুখোশ।

অথচ পাথর আর শব্দের এই স্থায়িত্ব :
এ শহর যেন প্রত্যেকের হাতে হাতে

জীবিত মৃত
অসংখ্য মৃত্যুতে লালিত নিস্তব্ধতার হাতে হাতে ফেরা এক পানপাত্র,
এ শহর যেন একটা প্রাচীর, অসংখ্য জীবন দিয়ে গাঁথা পাথরের পাপড়ি
অবিলোপী গোলাপ, আবাসভূমি,
হিমেল উপনিবেশের এ যেন আন্দেয়ান প্রবালপ্রাচীর ঘেরা একটা ছোট্ট হ্রদ।

কাদামাটি-রঙের হাত যখন সত্যিই কাদা হয়ে গেলো
বন্ধ হয়ে এলো চোখের পাতা
জীবন্ত প্রাণের স্পন্দনে পরিপূর্ণ দুর্গপ্রাচীর
আর সমস্ত মানুষ যখন তালগোল পাকানো তার গোপন গুহায়,
অসীম ঊর্ধ্বে রয়ে গেলো যথার্থতা :
মানবিক নিশান্তিকায় উত্তুঙ্গ চূড়ার অবস্থান :
নিস্তব্ধতাকে ধরে রাখার জন্যে বিশালতম পাত্র :
অসংখ্য জীবন নিয়ে পাথরের একটা জীবন।

আট

আমার সঙ্গে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে চলো, আমেরিকান ভালোবাসা।

আমারই সঙ্গে চুম্বন করো এই পাথর।

উরুবাম্বার বহমান রুপোর স্রোত
তার হলুদ পাত্রে এলোমেলো ছড়ায় পুষ্পরেণু।
লতানো আঙুর, শিলীভূত গাছ আর কঠিন মালার শূন্যতা
এলোমেলো ছড়ানো কফিনের সারাটা নির্জনতায়।
পৃথিবীর দুটি ডানার মাঝে এসো ক্ষুদ্র জীবন,
যখন প্রহৃত হিমেল বাতাস
যখন ছিন্নভিন্ন পান্নাসুসজ্জিত বিধ্বস্ত বাতাস
তুষার থেকে তুমি নেমে এলে হে নিষ্ঠুর জলরাশি।

ভালোবাসা, আহা, ভালোবাসা! যতক্ষণ না

প্রতিধ্বনিত আন্দেয়ানের চকমকি পাথরের প্রান্ত থেকে
অতর্কিতে রাত্রি নামে নিশান্তিকার আরক্ত জানুতে,
তুমি অপলক তাকিয়ে থাকো
তুষারের সম্পূর্ণ অন্ধ শিশুটার দিকে।

জলদমন্দ্রিত সুরতরঙ্গের হে উইলকামাউ,
আহত তুষারের মতো শুভ্র ফেনায়
তুমি যখন ভাঙলে তোমার বজ্ররেখা
যখন তোমার দমকা বাতাসের পদপাত গান গাইলো
নির্মম স্বননে জাগিয়ে তুললো আকাশ,
কোন কাহিনী তুমি শোনালে
ছিটকে ওঠা তোমার আন্দেয়ান ফেনার কানে কানে ?
কে বন্দী করলো তুষারের বিদ্যুল্লতা
শৃঙ্খলিত করে রাখলো তাকে গগনচুম্বী পাহাড়ের অন্তিম চূড়ায়,
বিচ্ছিন্ন করলো তার হিমবাহের অশ্রু
আমূল বিদ্ধ করলো তার তীক্ষ্ণ তরবারি
তার যোদ্ধৃ কেশরকে বিধ্বস্ত করে বয়ে নিয়ে গেলো
পাহাড়ি উপান্তে, তার বিজয়ী শয্যায় ?

কি কথা শোনালো তোমার অবরুদ্ধ প্রতিচ্ছবি ?
তোমার নিভৃত বিদ্রোহী বিদ্যুতের শিখা কি আবার পাড়ি দিলো জনপদ ?
তোমার শীর্ণ ধমনীর জলোচ্ছ্বাসে
কে ভাঙলো গাঢ় ভাষা, নিটোল অক্ষরমালা,
সোনালী নিশান, অতল মুখ আর মগ্ন আর্তনাদ ?
কে ছিন্ন করলো পৃথিবীর বুকে সতর্ক দৃষ্টি মেলে থাকা
তোমার অপলক পুষ্পিত চোখের পাতা ?
তোমার ভূত্বকের গহন অঙ্গারে
রাত্রির ফসলগুলোকে নিঙড়ে নেবে বলে
কে ছুঁড়ে দিলো মৃত পল্লব, তোমার জলপ্রপাতের বাহু ?
অতটে কে ছড়ালো গুচ্ছগুচ্ছ শৃঙ্খলিত শাখা

কে আবার বিলুপ্ত করলো তোমার শেষ বিদায়ের বাণী ?

ভালোবাসা, আহা ভালোবাসা ! স্পর্শ করো না সীমান্তরেখা
শ্রদ্ধা করো না মগ্ন কপাল :
সময়কে পূর্ণ করতে দাও তার ফলশ্রুতি
তার ভগ্ন স্রোতধারার নিভৃত নিকুঞ্জে,
পৈঠা আর খরস্রোতের মাঝে
সঞ্চয় করতে দাও গভীর গিরিখাদের থমথমে ভারি বাতাস
বাতাসের সমান্তরাল ঝিল্লিরাজি
পর্বতমালার অন্ধ প্রণালী
শিশিরের নিষ্ঠুর অভিনন্দন
আর ওপর থেকে আছড়ে পড়া আহত নাগিনী ।

অরণ্য, রুক্ষ উপল আর পাহাড়ি উপত্যকায়
সবুজ নক্ষত্রের ধুলো আর উজ্জ্বল গাছেদের বনাঞ্চলে
মাস্তুল ফেটে পড়লো স্পন্দিত হৃদের মতো
অথবা নিস্তব্ধতার হর্ম্যতল ।

এসো আমার সত্তায়, আমার গহনতম আপন অস্তিত্বে
সম্পূর্ণ সুসজ্জিত আমার সেই আশ্চর্য নির্জনতায় ।

মৃত সাম্রাজ্য এখনো স্পন্দিত, উজ্জ্বল ।
তারপর অতিক্রম করে যাও সূর্যঘড়ি
সমুদ্রে ঘুরে বেড়ানো কালো জাহাজের মতো
বিশাল শকুনের রক্তলোলুপ ছায়া ।

নয়

নাক্ষত্রিক ঈগল আর কুয়াশার আঙুরপুঞ্জ ।
অবলুপ্ত দুর্গপ্রাচীর আর অন্ধ খড়্গ ।
নক্ষত্রখচিত মেখলা আর মন্ত্রপূত রুটি ।
বহমান সিঁড়ি আর বিশাল আঁখিপল্লব ।

ত্রিভুজাকৃতি আংরাখা আর পাথরের পুষ্পরেণু।
গ্র্যানাইটের প্রদীপ আর পাথরের রুটি।
ধাতব নাগিনী আর পাথরের রক্তগোলাপ।
মগ্ন জাহাজ আর পাথরের জলপ্রপাত।
চান্দ্র-অশ্ব আর পাথরের আলোক।
নিরক্ষীয় চতুষ্কোণ আর পাথরের বাষ্পপুঞ্জ।
চরম জ্যামিতি আর পাথরের পাঠমালা।
ঝড়ে বিদীর্ণ বরফের বিরাট চাঁই।
নিমগ্ন সময়ের রক্তপ্রবাল।
আঙুলে মসৃণ দেওয়াল।
ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ পাখির পালকে বিধ্বস্ত ছাদ।
গুচ্ছ গুচ্ছ আয়না আর ঝড়ের স্তম্ভমূল
জড়ানো লতায় ভূলুণ্ঠিত সিংহাসন।
শিকারি থাবার নিষ্ঠুর শাসন।
ঢালুতে নোঙর বাঁধা ঘূর্ণি ঝড়।
ইন্দ্রনীলের নিশ্চল জলপ্রপাত।
নিদ্রালস মানুষের পিতৃতান্ত্রিক ঘণ্টাধ্বনি।
অবদমিত তুষারের শৃঙ্খল।
প্রতিমূর্তির গায়ে কঠিন লৌহময়তা।
দুর্লভ নিরুদ্ধ ঝড়।
হিংস্র পুমার বাহু আর রক্ত-তৃষিত পাহাড়।
ছায়াচ্ছন্ন মিনার আর তুষারের সংলাপ।
আঙুল আর শিকড়ে শিকড়ে উঠে আসা রাত্রি।
কুহেলির খোলা বাতায়ন আর শিলীভূত বন-তিতির
নৈশকালীন উদ্ভিদ আর মেঘগর্জনের প্রতিমূর্তি।
অপরিহার্য পর্বতমালা আর সামুদ্রিক ছাদ।
পাহাড়ি মৌমাছি আর হারানো ঈগলের স্থাপত্য।
রক্ত কলঙ্কিত সমতল আর গড়ে তোলা নক্ষত্রমালা।
ধাতব বুদবুদ আর বৈদূর্যমণির চাঁদ।
আন্দেয়ানের সরীসৃপ আর পারিজাতের কপাল।

নিস্তব্ধতার গম্বুজ আর পবিত্র স্বদেশভূমি।
সমুদ্রের নববধূ আর গির্জার গাছপালা।
লবণের পল্লব আর কালো-ডানার চেরি।
তুষারের দাঁত আর হিমেল বজ্র।
নখের আঁচড়ে ক্ষত-বিক্ষত চাঁদ আর আতংকিত পাহাড়।
আর্দ্র চুলের ঘূর্ণি আর বাতাসের ব্যস্ততা।
রুপালি ঢেউ আর সময়ের নির্দেশনা।

দশ

পাথরের পর পাথর : কোথায় ছিলো মানুষ ?
বাতাসের গায়ে বাতাস : কোথায় ছিলো মানুষ ?
শতাব্দীর পর শতাব্দী : কোথায় ছিলো মানুষ ?
আর তুমিই বা কোথায় ছিলে
অসম্পূর্ণ মানুষ আর শূন্যগর্ভ ঈগলের তুচ্ছ ভগ্নাংশ,
আজকে দিনের পথে পথে পায়ের চিহ্ন ফেলে
মৃত শরতের পল্লবজালে
যতক্ষণ না বিধ্বস্ত হৃদয় মুখ থুবড়ে পড়লো কবরের রুক্ষ মাটিতে ?
রিক্ত হাত, জীর্ণ পায়ের পাতা, নিঃস্ব জীবন···
আলোর অস্পষ্ট দিনগুলি এসে পড়ছে তোমার মুখে
উৎসবের কেতনচূড়ায় বৃষ্টির ফোঁটার মতো
পাপড়ির পর পাপড়ি
ওরা কি ঝরালো ওদের অন্ধকার শস্যকণা
তোমার রিক্ত মুখে ?
ক্ষুধা—মানুষের রক্তপ্রবাল
ক্ষুধা—গোপন উদ্ভিদ, কাঠুরের শক্ত শিকড়
ক্ষুধা—প্রবালপ্রাচীরের রুক্ষ রেখা
পাড়ি দিলো কি তোমার উত্তুঙ্গ ভগ্ন মিনার ?

আমি তোমাকে প্রশ্ন করি, রাজপথের লবণরাশি

আমাকে দেখাও কণিক : স্থাপত্য,
আমি চূর্ণ করে দেখতে চাই তোমার পাথরের পরাগ-কেশর
শূন্যতায় বাতাসের সবকটা সিঁড়ি বেয়ে আমি ওপরে উঠতে চাই
তোমার প্রত্যন্ত প্রদেশ তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখতে চাই
যতক্ষণ না স্পর্শ পাই মানুষের।

মাকচু পিচ্চু,
তুমি কি সাজিয়েছো পাথরের পর পাথর
আর স্তম্ভমূলে জীর্ণ ছিন্ন এই চীরবাস ?
প্রবালের পর প্রবাল আর পাদদেশে অশ্রুবিন্দু ?
সোনার গায়ে আগুনের শিখা, আর তার গহন গভীরে
রক্তের গাঢ় লাল বৃষ্টির ফোঁটা !
তোমার বিলুপ্ত ক্রীতদাস আবার ফিরে এলো আমার কাছে !
তোমার বুক থেকে অগ্ন্যুদ্গারে বেরিয়ে আসা
নিঃস্বর কঠিন রুটি,
আমাকে দেখাও তোমার ভূমিদাস আর তার বিধবা স্ত্রীর রিক্ত পোশাক।
আমাকে বলো ও যখন জীবিত ছিলো কেমন করে ঘুমতো।
আমাকে বলো ওর ঘুম কি কর্কশ, অর্ধোন্মুক্ত দুটি ঠোঁট
যেন অজস্র ক্লান্তিতে গড়া দেওয়ালে এক জমাট অন্ধকার !
দেওয়ালের পর দেওয়াল !
আমাকে বলো
পাথরের প্রতিটি হর্ম্যতল কি চেপে বসেছিলো ওর ঘুমের ওপর
আর ও ঘুমিয়ে পড়েছিলো মৃত্যুর মতো গাঢ় স্বপ্নে
যেন প্লাবিত জ্যোৎস্নায় !

প্রাচীন আমেরিকা, জলের অতলে তলিয়ে যাওয়া নববধূ,
তোমার আঙুলও কি
অরণ্য থেকে ধেয়ে এলো ঈশ্বরের অসীম শূন্যতার দিকে,
বল্লম আর মাদলের বজ্রনিনাদে মেশা
শ্রদ্ধা আর আলোকের মাঙ্গলিক ধ্বজার নিচে,

তোমার আঙুলও কি
তোমার সেইসব আঙুল
যা আবার নতুন করে তোমারি রুক্ষ কঠিন পাথরের বুকে
রোপণ করে বিমূর্ত গোলাপ,
তুষারের রেখা, নতুন ফসলের রক্তাক্ত মঞ্জরী!
বিলুপ্ত আমেরিকা,
তুমিও কি অন্ত্রের অতল তিক্ততায় ক্ষুধিত ঈগলের মতো
জিইয়ে রেখেছিলে দীর্ঘ উপবাস ?

এগারো

এলোমেলো বিশৃঙ্খল দীপ্তি এড়িয়ে
পাথুরে রাত্রির গভীরে আমার হাত ডোবাতে দাও,
হাজার বছর ধরে বন্দী একটা পাখির মতো
আমার বুকের গভীরে
স্পন্দিত হতে দাও তার বিস্মৃতির প্রাচীন হৃদয়!
আজ আমাকে ভুলতে দাও
সমুদ্রের চেয়েও বিস্তীর্ণ এই আনন্দ,
কেননা মানুষ
সমুদ্র আর তার দ্বীপপুঞ্জের চেয়ে অনেক অনেক বেশি বিস্তীর্ণ,
যে কেউ তাকে উপলব্ধি করতে পারে
যেমন সমাচ্ছন্ন মগ্ন প্রত্যয়ে উপলব্ধি করা যায় ঝরনার স্বচ্ছ গভীরতা।
বিশাল পাহাড়, আমাকে ভুলতে দাও তোমার বলিষ্ঠ সৌষ্ঠব
তোমার অনন্য বিস্তৃতি,
তোমার মধুচক্রাকৃতি পাথর।
ঘোড়ার খুরের মতো
আরক্ত গুবরেপোকার ডানার মতো
ক্রোধোন্মত্ত শকুন যখন তার পাখার ছন্দে আঘাত করে আমার কপাল,
আর তার রক্তলোলুপ পালকের প্রচণ্ড ঝড়ে ওড়ে
একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্ত অবধি সোপানশ্রেণীর অন্ধকার ধুলো,
আমি তখন ক্ষিপ্র শিকারি পাখিটাকে কোথাও দেখতে পাই না

না তার থাবার অন্ধ বৃন্তটাও।
আমি দেখি কেবল প্রাচীন মানুষ
ভূমিদাস আর প্রান্তরে নিদ্রাতুর কৃষক,
আমি দেখি কেবল একটি দেহ, অসংখ্য অগণন দেহ
একটি পুরুষ, অসংখ্য অগণন নারী,
রাত্রি আর বৃষ্টিতে গাঢ় অন্ধকার বাতাসের নিচে
পাথরের ভারি প্রতিমূর্তিটার পাশে :
পাথর কাটা শ্রমিক জুয়ান, উইরাকোচার সন্তান
শীতে কাঁপা জুয়ান, সবুজ নক্ষত্রের সন্তান
নগ্ন পা জুয়ান, ইন্দ্রনীলের প্রপৌত্র,
তুমি জেগে ওঠো, আমার সঙ্গে মাথা তুলে দাঁড়াও, ভাই আমার

বারো

তুমি জেগে ওঠো, আমার সঙ্গে মাথা তুলে দাঁড়াও, ভাই আমার।

তোমার সুদূর প্রসারী দুঃখের গহন গভীর থেকে
আমার দিকে বাড়িয়ে দাও তোমার হাত।
পাহাড়ের অতল থেকে তুমি আর ফিরে আসবে না।
কবরের অতীত অন্ধকার থেকে তুমি আর ফিরে আসবে না।
ফিরে আসবে না তোমার পাথর-জমাট কণ্ঠস্বর।
ফিরে আসবে না তোমার উদ্গ্রীব দুটো চোখ।

মাটির অন্তর্দেশ থেকে আমার দিকে তাকাও
কৃষাণ :
তাঁতি :
নির্বাক মেষপালক :
প্রতিপালিত লামার রক্ষক :
দুঃসাহসী ভারার রাজমিস্ত্রী :
আন্দেয়ান অশ্রুর ভিস্তিওয়ালা :
ক্ষোদিত আঙুলের মণিকার :

পিছল কাদামাটির মৃৎশিল্পী :
নতুন জীবনের এই পানপাত্রে আনো তোমার অতীতের হারানো দুঃখ।

আমাকে দেখাও তোমার রক্ত, তোমার ত্রিবলীরেখা,
আমাকে বলো : এখানে আমি শাস্তি পেয়েছিলাম
কেননা চুনীপান্নার দ্যুতি তখন ছিলো না আশ্চর্য উজ্জ্বল
কিংবা ধরিত্রী সেদিন আত্মসমর্পণ করেছিলো পাথর আর ফসলের পায়ে :
আমাকে দেখাও সেই পাহাড়
যার ওপর তুমি আছড়ে পড়েছিলে,
সেই স্তব্ধ মহীরুহ যার গায়ে ওরা তোমাকে ক্রুশবিদ্ধ করে মেরেছিলো।
আমার জন্যে আবার জ্বালাও তোমার অতীত চকমকি,
তোমার প্রাচীন প্রদীপ,
শতাব্দীর পর শতাব্দী
চাবুকে চাবুকে রক্তাক্ত নগ্ন তোমার গভীর ক্ষত
আর রক্তেভেজা কুঠারগুলো আশ্চর্য উজ্জ্বল।
তোমার মৃত মুখ থেকে কথা বলবো বলে আমি উঠে এলাম।
এ পৃথিবীতে সম্মিলিত করো যত বিচ্ছিন্ন নিশ্চুপ ঠোঁট
এবং অতলান্ত থেকে আমার সঙ্গে কথা বলো
সারারাত
সারাটা রাত
যেন আমি তোমাদেরই মাঝে একই নোঙরে বাঁধা :
আমাকে বলো যা কিছু সবই—
পায়ে পায়ে, শৃঙ্খলের পর শৃঙ্খল, সারির পর সারি :
তীক্ষ্ণ করো তোমার লুকানো ছুরি,
তারপর রেখে দাও আমার বুকে
আমার হাতে
পীতাভ আলোর নদীর রেখার মতো
বিলুপ্ত শার্দুলের নদীর রেখার মতো,
আর ঘণ্টার পর ঘণ্টা
দিনের পর দিন

আমাকে কাঁদতে দাও নাক্ষত্রিক শতাব্দীপুঞ্জ, হে অন্ধযুগ !

আমাকে দাও তোমার নিস্তব্ধতা, তোমার জলোচ্ছ্বাস, তোমার আশা ।

আমাকে দাও তোমার সংগ্রাম, তোমার লৌহময়তা, তোমার আগ্নেয়গিরি ।

তোমার দেহভার আমার দেহে নিবিড় জড়িয়ে থাক চুম্বকের মতো ।

গ্রহণ করো এই আমার মুখাবয়ব আমার শিরা উপশিরা ।

কথা বলো আমার শব্দপুঞ্জে, আমার এই উচ্ছল রক্তস্রোতে ।

মাকচু পিকচু প্রাচীন ইনকা সাম্রাজ্যের একটি দুর্গম শহর। সমুদ্র-পৃষ্ঠ থেকে বারো হাজার ফুট উঁচুতে পেরুভিয়ান আন্দিজ পর্বতমালার ওপর অবস্থিত। প্রায় পাঁচ হাজার বছর পূর্বের তৈরি আমেরিকার সবচেয়ে প্রাচীন এই শহরটির অস্তিত্ব শতাব্দীর পর শতাব্দী মানুষের কাছে অজ্ঞাত ছিলো। ১৯১২ সালে হিরাম বিনগামই প্রথম প্রত্নতাত্ত্বিক তৎপরতা চালিয়ে মাকচুর পিকচুর অস্তিত্ব সম্পর্কে আলোকপাত করেন। যদিও শহরটির উপরিভাগের সবকিছুই বিধ্বস্ত, তবু তার হর্ম্যতল, খাড়া দেওয়ালগুলো এখনো অক্ষত।

ইগুয়ানার গোধূলিবেলা।
যুদ্ধ-জাফরির রামধনু-আকৃতি খিলান থেকে
বল্লমের মতো তার দীর্ঘ জিহ্বা
হারিয়ে যাচ্ছে সবুজ পত্রালির গহন গভীরে,
আর একঝাঁক পিঁপড়ে, সন্ন্যাসীর মতো ছন্দিল পায়ে
অরণ্যে উধাও।
গুয়ানাকো, বিস্তীর্ণ মেঘের চূড়ায়
শীর্ণ হাওয়ার মতো
চলেছে একা, সোনার জুতো পায়ে,
যখন লামা তার আবিল চোখদুটো মেলে দিলো
শিশিরসিক্ত পৃথিবীর
ভঙ্গুর শুভ্রতায়।
মুজোর পাখা মেলে দেওয়া রঙিন প্রজাপতিদের চমকে দিয়ে
পরাগের প্রাচীরগুলোকে দলে মুচড়ে
বানরেরা নিশান্তিকার তটরেখা অবধি বিস্তীর্ণ
যৌনবিষয়ক ভাবনাকে কেবলই মেলে চলেছে
কেবলই মেলে চলেছে।
ভয়াল কুমীরদের রাত্রি
নিটোল রাত্রি,
কাদার মধ্যে নাক উঁচিয়ে নিঃশব্দে বুকে হেঁটে
ঘুমন্ত নোনাবাদা, চিত্রিত অরণ্যের নানান শব্দ পেরিয়ে
ওরা ফিরে যাচ্ছে সেই ভূমিতে যেখানে একদিন ওরা জন্মেছিলো।
উজ্জ্বল নির্জনতায়
হিংস্র জাগুয়ারটা পাতায় গা ঘষছে,
দাবাগ্নির মতো পুমাটা ছুটে গেলো ঘন ডালপালার মধ্যে দিয়ে,
অরণ্যের মাতাল চোখদুটো জ্বলে উঠলো তার চোখের গভীরে।
নদীবেলায় ব্যাজারের সারি সারি পায়ের চিহ্ন,
রক্তলোলুপ দাঁতে

পাখিদের নীড় শূন্যকে শূন্যকে ফিরছে।
আর অতল জলরাশির নিচে
অতিকায় অ্যানাকণ্ডা সাপটা
যেন পৃথিবীকে বেড় দিয়ে
পাঁকের যজ্ঞীয় অনুষ্ঠানে নিজেকে আবৃত রেখে ঘুমিয়ে আছে।

ওরা এলো দ্বীপগুলোর জন্যে (১৪৯৩)

কসাইরা দ্বীপগুলোকে সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত করে দিলো।
নির্যাতনের সে ইতিহাসে
গুয়ানাহানিই সর্বপ্রথম।
নরম কাদার শিশুরা দেখলো
তাদের মুখের হাসিটা কখন মিলিয়ে গেছে,
ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে তাদের হরিণের মতো ভীরু আস্তানাগুলো,
মৃত্যুর সারাটা পথ তারা কিছুই বুঝতে পারলো না।
তাদের বেঁধে চাবকানো হলো,
তাদের জ্বালিয়ে পুড়িয়ে শেষ করে দেওয়া হলো,
তাদের টুকরো টুকরো করে কবরে পোরা হলো।
তারপর তালবীথির মাঝে চটুল ছন্দে
যখন নাচতে নাচতে আবার সময় এলো
দেখা গেলো সবুজ হলঘরটা শূন্য।

মানুষ আর ঈশ্বরের মহান গৌরব জানবার মতো
আর কিছুই অবশিষ্ট নেই,
কেবল ক্রুশকাঠের আকারে শক্ত করে বাঁধা
নগ্ন অস্থি ছাড়া।

চীনামাটির প্রধান খনিঅঞ্চল

আর সৌতাভেন্তোর সবুজ শাখা থেকে
প্রবাল দ্বীপ পর্যন্ত
নার্ভায়েজের তীক্ষ্ণধার ছুরি আশ্চর্য নিপুণভাবে ঘুরে গেছে
এখানে ক্রুশকাঠ, এখানে জপমালা,
এখানে কুমারী মেরীমাতা।
প্রজ্বলিত কিউবার ফরফরাস, কলম্বাসের যাকিছু মনিমুক্তো
সঞ্চিত করে রাখা হয়েছে তার ভিজে বালিতে।

চিলির আবিষ্কারক

সুদূর উত্তর থেকে আলমাগ্রো এনেছিলেন বিধ্বস্ত অঙ্গার।
তারপর বিস্ফোরণ আর সূর্যাস্তের মাঝে
সারাটা ভূখণ্ড জুড়ে দিনরাত সারাক্ষণই তিনি ঝুঁকে থাকতেন
যেন ঝুঁকে আছেন কোনো মানচিত্রের ওপর।
কাঁটার ছায়া, বাবলার ছায়া, মোমের ছায়া,
মার-খাওয়া ভূখণ্ডের রণকৌশল লক্ষ্য করতে করতে
স্পেনদেশীয় মানুষটা তাঁর শুকনো অবয়বে মিশিয়ে দিতেন সবকিছু।
রাত্রি, তুষার আর বালি দিয়ে গড়া আমার এই শীর্ণ স্বদেশভূমি.
তার দীর্ঘ তটরেখা জুড়ে যাকিছু নৈঃশব্দ্য,
তার সামুদ্রিক কপোল থেকে উঠে আসে শুধু সাদা ফেনা.
তার রহস্যময় চুম্বন জুড়ে কেবল কয়লা।
জ্বলন্ত অঙ্গারের মতো তার পাঁচ আঙুল থেকে গলে পড়ে সোনা
আর সবুজ চাঁদের মতো রুপো
বিষণ্ণ গ্রহের গাঢ় ছায়াটাকেও করে তোলে আশ্চর্য আলোকিত।
গোলাপ, জলপাইয়ের তেল, সুবর্ণ মদিরা আর দুর্লভ আকাশের
খুব কাছাকাছি বসে থেকেও সেই স্পেনদেশীয় মানুষটা
টেরও পেলেন না সামুদ্রিক ঈগলের পুরীষ থেকে
কেমন করে জন্ম নিলো বিক্ষুব্ধ পাথরের এই বিন্দুটা।

স্তবগাথা

পিতৃভূমি, হে আমার স্বদেশ, তোমার দিকে ফেরাই আমার রক্তস্রোত।
অথচ তোমার জন্যে আমার আকাঙ্ক্ষা
মায়ের জন্যে শিশু যেমন অশ্রুসজল।
গ্রহণ করো এই অন্ধ গীটার
আর এই হারানো হৃদয়।

পৃথিবীর পথে পথে আমি বেরিয়ে পড়েছিলাম
তোমাকে শিশুদের খুঁজে এনে দেবো বলে,
আমি বেরিয়ে পড়েছিলাম যারা ভ্রষ্ট তোমার তুষার নামে তাদের যত্ন করবো বলে,
আমি বেরিয়ে পড়েছিলাম তোমার শক্ত কাঠের গুঁড়িতে ঘর বাঁধবো বলে,
আমি বেরিয়ে পড়েছিলাম আহত বীরদের জন্যে তোমার জ্বলজ্বলে
বিশাল নক্ষত্রটাকে ছিনিয়ে এনে উপহার দেব বলে।

এখন আমি ঘুমতে চাই তোমার সত্তায়।
আমাকে দাও তোমার টানটান ছিলার স্বচ্ছ রাত্রি
তোমার পালতোলা নৌকার স্বচ্ছ রাত্রি, তোমার নাক্ষত্রিক বিশালতা।

হে আমার স্বদেশ : আমি চাই আমার ছায়াকে বদলে দিতে।
হে আমার স্বদেশ : আমি চাই আমার গোলাপকে পালটে নিতে।
আমি চাই তোমার শীর্ণ তনু ঘিরে আমার দুবাহু জড়াতে,
আর বসতে চাই সমুদ্রোচ্ছ্বাসে চূর্ণিত তোমার শিলায়
যাতে আমি গমের একটি কণাও স্বচ্ছ দেখতে পারি।
এবার আমি তোমার উজ্জ্বল নির্জন ফেনায় চোখ রেখে
তোমার দীপ্ত লাবণ্যের জন্যে গাঁথবো সমুদ্রবেলার একখানা মালা।

স্বদেশ, হে আমার পিতৃভূমি,
প্রতিরুদ্ধ জল আর তুষারে আদিগন্ত ঘেরা
ঈগল আর গন্ধকে তুমি একাকার

তোমার দাক্ষিণ মেরুজাত আরমিনের লোম আর নীলকান্তমনির হাতে
শুদ্ধ মানবিক আলোর একটা বিন্দু
শত্রুর আকাশ রাঙিয়ে জ্বলজ্বল করে জ্বলছে।

সেই আলোকে তুমি আগলে রাখো, হে স্বদেশভূমি,
শংকাতুর অন্ধ বাতাসেও তুমি আকাশে তুলে ধরো
তোমার আশার মঞ্জরিত শস্যকণা।

তোমার দূর দূরান্তব্যাপী বিস্তীর্ণতায় ছড়িয়ে পড়েছে এই দুর্লভ আলোক-
মানুষের ভবিতব্য,
ঘুমন্ত আমেরিকার বিপুল ব্যাপ্তিতে
এমনিভাবে তুমি আগলে রাখো
একক প্রাণের নিঃসঙ্গ এক রহস্যময় মুকুলকে।

চিলির সমুদ্র

দূর দূরান্তে তোমার ঊর্মিল পায়ের পাতা, তোমার বিস্তীর্ণ সমুদ্রসৈকত ছুঁয়ে
আমি ফিরছি উন্মত্ত, নির্বাসিত আর অশ্রুসজল।
আজ আমি এসে পৌঁছলাম তোমার উৎসে,
তোমার কপোল প্রান্তে।
না রক্তপ্রবাল না প্রজ্বল নক্ষত্র
না দীপ্যমান পরাজিত জলধারা কাউকেই আমি জানাইনি
সেই দুর্লভ গোপনীয়তা, এমন কি না একটা অক্ষরও।
আসবাব আর পুরানো জামাকাপড়ের মধ্যে
আমি ধরে রেখেছি তোমার ভয়াল কণ্ঠস্বর,
অধিষ্ঠাত্রী বালুরাশির একটা পাপড়ি।
বিশাল ঘণ্টার ধুলো আর সিক্ত একটা গোলাপ।
অজস্রবার আরাউকোর সেই জলরাশি, তীব্র ক্ষারজল :

অথচ আমি সঞ্চিত রেখেছি আমার মগ্ন পাথরটাকে যার মধ্যে তোমার
ছায়ার প্রকম্পিত রলোরোল।
চিলির সমুদ্র, হে জলরাশি
প্রখর বহ্নুৎসবের মতো উত্তুঙ্গ আর নিটোল
নীলকান্তমনির দ্যুতি, বজ্র আর নখাভাস,
হে লবণ আর সিংহের ভূমিকম্প !
এ পৃথিবীর শৈলসানু, উৎস আর সমুদ্রসৈকত, তোমার আঁখিপল্লব
নক্ষত্রের নীলকে ছিনিয়ে এনে
মেলে আছে স্থলভূমির দক্ষিণে !
লবণ আর ধাবমান গতি তুমি ছড়িয়ে দাও সমুদ্রে
মানুষের গুহাকন্দরে
সামগ্রিক বস্তুর গহন গভীরে
যতক্ষণ না দ্বীপের ওপারে বিমুক্ত তোমার দেহভার।
নির্জন উত্তরের সমুদ্র,
তোমার খনিপ্রান্তরে আছড়ে পড়া সমুদ্র,
রুক্ষ আর নির্জন দেশের বাসিন্দাদের জন্যে তুমি তুলে ধরো লবণরাশি,
হিমেল সূর্যের শিলা আর সমুদ্রসারস।
অমানুষিক নিশান্তিকায় দগ্ধ হে বেলাভূমি !
ভালপারাইসোর সমুদ্র. নৈশসংগীত
আর নির্জন আলোর ঊর্মিমালা, সমুদ্রের বাতায়ন তুমি
যেখান থেকে আমার স্বদেশভূমির প্রতিমূর্তি
এখনো অন্ধ দু চোখ অপলক চেয়ে থাকে।
দক্ষিণের সমুদ্র, মহাসমুদ্র,
হে সমুদ্র, ইমপেরিয়্যালে কড়িগাছে জড়ানো শঙ্কাতুর রহস্যময় চাঁদ
চিলোয়ে রক্তস্নাত
এবং ম্যাগেলান থেকে সীমান্ত অবধি
লবণের তীক্ষ্ম আর্তনাদ, সম্পূর্ণ উন্মাদ একটা চাঁদ
আর তুষারের নক্ষত্রখচিত পলাতক একটা ঘোড়া।

ম্যাগেলানের হৃদয় (১৫১৯)

সুদূর দক্ষিণের কথা মনে পড়ে হঠাৎ রাত্রে ঘুম ভেঙে জেগে উঠি

কোথায় ছিলুম, কোথা থেকে যে ছাই এলুম,
নিজেই নিজেকে জিগেস করি, আজ কি বার, কি খবর,
ঘুমের মধ্যে নাক ডাকাই, স্বপ্নের মধ্যে দেখি সেই গাছ, সেই রাত্রি,
চোখের পাতার মতো ঢেউ ভাঙে, ঢেউ থেকে জন্ম নেয়
একটা দিন, বাঘের নাকের মতো বিদ্যুতের তীব্র ঝলক।

দিনটা এসে আমাকে জিগেস করে, 'তুমি কি শুনতে পাচ্ছো
পাটাগোনিয়ার ওপর দিয়ে ধীরে বয়ে যাওয়া
জলের শব্দ ?'
আমি বলি, 'হ্যাঁ, শুনতে পাচ্ছি।'
দিনটা এসে আমাকে জিগেস করে, 'ওই দূরে
বিস্তীর্ণ প্রান্তরে একটা বুনো ভেড়া উপলের গা থেকে
তুষারে জমাট রঙ চাটছে, তুমি কি শুনতে পাচ্ছো না তার আর্তস্বর,
চিনতে পারছো না সেই নীল দমকা বাতাস
যার হাতে চাঁদটা ছোট্ট একটা পানপাত্র,
দেখতে পাচ্ছো না দুড়দাড় ছুটে চলা পশুর পাল,
শূন্য আংটি হাতে বাতাসের হিংসুটে আঙুল
স্পর্শ করছে ঢেউ আর জীবন ?'

মনে পড়ে গিরিসংকটের সেই ধূসর নির্জনতা

যেখানেই যাই পায়ে পায়ে জড়িয়ে থাকে সুদীর্ঘ রাত আর দেওদার
অবদমিত ক্লান্তি আর তিক্ত অবসাদ
ছিন্নভিন্ন করে দেয় আমার জীবনের যাকিছু সব সব।
তুষারের ছোট্ট একটা কণাও কাঁদে, আমাকে খুঁজতে এসে
দুয়ারে বসে তার ধূমকেতুর বিশ্রী ছেঁড়াখোঁড়া পোশাক দেখিয়ে

সে ভুগরে ভুগরে কাঁদে।

বিস্তীর্ণ ঘাসের প্রান্তরে বাতাসের হাহাকার,
তার বিপুল বিস্তার, কেউ দেখে না এসব।
আমি এগিয়ে গিয়ে বলি : চলো, যাই।
বালির মধ্যে প্রবাহিত দক্ষিণকে আমি স্পর্শ করি,
দেখি কালো কালো শুকনো গাছপালা, কেবল শেকড় আর শিলা,
জল আর আকাশে আঁচড়ানো দ্বীপমালা,
ক্ষুধার্ত নদী, ভস্মের আত্মা,
বিষণ্ন সমুদ্রের আঙিনা, আর যেখানে
নিঃসঙ্গ বিষাক্ত একটা সাপিনী ক্রুদ্ধ গর্জন করে, যেখানে সর্বশেষ
আহত খেকশিয়ালটা তার রক্তাক্ত সম্পদ লুকোবার জন্যে গর্ত খোঁড়ে
ঝড়ের সঙ্গে আমার দেখা হয়, তার উল্লসিত গর্জন
তার প্রাচীন পৃথির কণ্ঠস্বর, তার শত-ওষ্ঠ-বিস্ফারিত মুখ
আমাকে কি যেন বলে, কি যেন ঝড়ের সঙ্গে প্রতিদিনই মিশে যায়।

আবিষ্কারকরা আসে, অথচ তাদের কোনো চিহ্নই থাকে না

একমাত্র সমুদ্রই জানে জাহাজটার কপালে কি ঘটেছিলো।
কঠিন ভিনদেশী মাটি আশ্রয় নিয়েছিলো তাদের করোটিতে
দক্ষিণী আতঙ্কে যা প্রতিধ্বনিত হতো রণভেরীর মতো
মানুষ আর বাইসনের চোখ দিনকে উপহার দিতো তাদের শূন্যতা,
তাদের অভিজ্ঞান, তাদের অদম্য জাগরণের প্রতিধ্বনি।
বুড়ো আকাশ খোঁজে পাল,
কেউ আজ আর বেঁচে নেই.
রুক্ষ মেজাজ নাবিকের চিতাভস্মের সঙ্গে পড়ে থাকে জলমগ্ন ভগ্ন জাহাজ,
নিভন্ত আগুনের একটুকরো কালো সৌরভ দিয়ে গড়া অন্তহীন নির্জনতা।

চারদিকে অসহ্য নির্জনতা

রাত্রি, জল আর বরফে ধীরে ধীরে ছিন্নভিন্ন হয়ে যায় পারিপার্শ্বিকতা.

সময় আর পরিসমাপ্তিতে সংকীর্ণ হয়ে আসে দিগন্ত :
বুনো রামধনুর গাঢ় নীল-লাল চিহ্ন নিয়ে
আমার দেশের পদযুগ মগ্ন থাকে তোমার বিশাল ছায়ায়.
অসহ্য যন্ত্রণায় তীব্র আর্তনাদ করে ওঠে আহত গোলাপ।

মনে পড়ে সেই প্রাচীন আবিষ্কারককে

নতুন করে আবার পাল তুলে নিয়ে যাওয়া হয়
তুষারে জমা শস্যকণা, লড়াইয়ের রসদ,
বরফ-ঢাকা শরৎ আর ক্ষণস্থায়ী যুদ্ধে আহত মানুষদের।
তার সঙ্গে যায় সেই প্রাচীন বৃদ্ধ, মৃত,
ভয়ঙ্কর সমুদ্রে যিনি দীর্ঘদিন নির্বাসিত ছিলেন,
আর তাঁর সঙ্গে, তাঁর পুরোভাগে, এগিয়ে চলে যত তুমুল রলোরোল।
বিশাল একটা সমুদ্রবিহঙ্গ এখনও তাঁকে অনুসরণ করছে,
চামড়ার জীর্ণ দড়াদড়ি, বৃদ্ধের অক্ষিকোটর থেকে ঠেলে বেরিয়ে আসা চোখ
আর ভাঙা মাস্তুলের আড়াল থেকে সে লক্ষ্য করে
সিন্ধুঘোটকীর মসৃণ গা বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে হাড় আর আংটি।

ম্যাগেলান

পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছেন উনি কোন দেবতা ? উকুনের ডিম ভর্তি দাড়ি.
ভারি আবহাওয়ায় জড়িয়ে গেছে ওঁর পাতলুন
যেন ক্ষিপ্ত কুকুরের মতো মরিয়া হয়ে দাঁত বসিয়ে চলেছে হাওয়া :
জলমগ্ন নোঙরের মতো নুয়ে পড়েছে বিশাল দেহভার,
সমুদ্র গর্জন করছে. উত্তুরে হাওয়া আছড়ে পড়ছে
ওঁর ভিজে পায়ের পাতায়।
সময়ের অন্ধকার ছায়া থেকে
বেরিয়ে আসা অশ্বারোহীর অর্ধবৃত্ত, ক্ষয়ে যাওয়া নাল, বিক্ষুব্ধ বেলাভূমির
প্রাচীন প্রভু, বংশপরিচয়হীন ঈগলের নীড়, বিষাক্ত কূপ,
আর প্রণালীর যত জলজ সার তোমাকে নির্দেশ দেয়,

তোমার বুকে কোনো ক্রুশচিহ্ন নেই, কেবল সমুদ্র-বাতাসের হাহাকার,
সামুদ্রিক আলো, তীক্ষ্ম নখর আর নিশ্চিহ্ন অঙ্কুশের তীব্র আর্তনাদ।

উনি পৌঁছলেন প্রশান্ত মহাসাগরে

যেহেতু সবশেষে একদিন সাঙ্গ হলো অভিশপ্ত সমুদ্রের দিন
আর নৈশবাহু একটা একটা করে খসিয়ে ফেললো তার আঙুল
যতক্ষণ না জন্ম নিলো মানুষ,
অধিনায়ক নিজের মধ্যে আবিষ্কার করলেন ইস্পাত,
আমেরিকা তুলে ধরলো তার বুদ্বুদ,
আর বেলাভূমি উপহার দিতে চাইলো ঊষায় মাতাল, জন্মমুহূর্তে বিশৃঙ্খল
তার বিবর্ণ খাঁড়ি,
তারপর জাহাজ থেকে ভেসে এলো আর্তচিৎকার, তলিয়ে গেলো,
আবার ভেসে এলো, আর তখনই ফেনা থেকে জন্ম নিলো এক
আশ্চর্য নিশান্তিকা।

সবাই মারা গেছে

জল, উকুন আর মাংসাশী গ্রহের ভাইসব
ঝড়ের প্রচণ্ড ধাক্কায় শেষ পর্যন্ত মাস্তুলগাছাটা যখন উলটে পড়েছিলো
তোমরা দেখেছিলে কি? দেখেছিলে কি অতর্কিত তুষারের নিচে
চূর্ণ হয়ে যাবার আগে পাথরটা কি ভয়ংকর আর্তনাদ করে উঠেছিলো?
শেষ পর্যন্ত হারিয়ে গেলো তোমাদের ইন্দ্রলোক,
শেষপর্যন্ত তোমাদের অভিশপ্ত সৈন্যবাহিনী,
শেষ পর্যন্ত বাতাসে বিদ্ধ তোমার অপচ্ছায়ারা
বালিতে চুম্বন করলো সীলমাছের পদচিহ্ন।
শেষ পর্যন্ত তোমাদের আংটিবিহীন আঙুলে এসে পৌঁছলো
উঁচু মালভূমির একটুকরো সূর্য, মৃত দিন,
কম্পমান ঢেউ আর পাথরের আরোগ্যশালা।

বৃষ্টিতে অশ্বারোহী

প্রথম বর্ষণ এলো, অবিরাম বৃষ্টির দেওয়াল, নুয়ে পড়ে
লবঙ্গ আর জনারের পাতা,
ভিজে ওঠে জাল,
ফোঁটায় ফোঁটায় বৃষ্টি ঝরে
বিশাল-বিক্ষুব্ধ উন্মত্ত আকাশ থেকে ভীষণ রাত্রির বুকে।
বৃষ্টির সোঁদা গন্ধে ছুটে যায় অশ্বারোহী,
রক্তকেশরের শাখা-প্রশাখায় ছিন্নভিন্ন বৃষ্টি আর পাথর :
আর ওদের দেহের ঢল-ভেঙে-নামা ছোট ছোট স্রোতস্বিনী
যেন জমে যাওয়া পলাতক বন্য পারাবত।
কোথাও কোন আলো নেই
কেবল অসহ্য কঠিন আবহাওয়া আর দুরন্ত সবুজ জলধারা.
ওদের খুরে খুরে ওড়ে মাটি
আর বৃষ্টিভেজা অশ্ব-গন্ধ সময়ের ধূলিকণা।
আচ্ছাদন, অঙ্গসজ্জা, রুপালী রেকাব.
ঘন লাল পুঞ্জীত উষ্ণ পৃষ্ঠদেশ চকিতে উধাও সব
প্রকম্পিত অরণ্যলীন প্রান্তসীমারেখা।

দূরে দূরে দূরে বহু-দূরে
বৃষ্টিকে আঘাত হানে দীপ্ত ঘোড়সওয়ার,
পেরিয়ে যায় তিক্ত আখরোটের বন.
বৃষ্টি তার চারদিকে ছড়ায় মুঠো মুঠো অবিলোপী মুক্তোর ফোঁটা।
প্রতিটা বিন্দুতে জ্বলে ওঠে আলোক,
পাতায় পাতায় বিদ্যুতের চকিত চমক
আর ঘোড়ার খুরের শব্দে মেশে মাটিতে আহত পাখাহীন বৃষ্টির জলোচ্ছ্বাস।
ভিজে লাগাম, পত্রালির নিভৃত অন্ধকার,
খুরে খুরে ঘোড়ার পায়ের শব্দ,
ভাঙা নক্ষত্রের নৈশ অরণ্যানী যেন তুষার কিংবা জ্যোৎস্নার আলো,
দুরন্ত ঘূর্ণীঝড়ের মতো ঘোড়া

বৃষ্টির তীরে ঢাকা যেন জমাট অশরীরী সব,
তীব্র উন্মত্ততায় জন্ম বলিষ্ঠ বাহু, থ্যাতলানো আপেল
আর ভীষণ ভয়ের চারপাশে উন্মত্ত নিশানের নিচে
পদদলিত সেই বিশাল সাম্রাজ্য।

ইরসিলা

আরাউকানিয়ান পাথর, বিচ্ছিন্ন জলপদ্ম
আর প্রসারিত শেকড়
স্পেন থেকে আগত মানুষটার মুখোমুখি দাঁড়ালো,
ভয়ংকর শৈবালের দুর্ভেদ্য প্রতিরোধ নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লো
তার বর্মের ওপর।
পর্ণসীর ছায়া ঘৃণায় মাড়িয়ে গেলো তার তরবারি
আর স্থানীয় আইভিলতা কক্ষচ্যুত গ্রহের
সদ্যজাত নীরবতার ওপর রাখলো তার নীল বাহু।
বজ্রকণ্ঠ ইরসিলা, আমি শুনেছি তোমার প্রথম অরুণোদয়ে
জলের ছলছলাৎ আর্তনাদ, পাখপাখালির ত্রস্ত উন্মত্ততা
আর অরণ্যানীর পত্রপল্লবে বজ্রের হুংকার।

ছুঁড়ে ফেলে দাও তোমার রক্তবর্ণ ঈগলের নখের আঁচড়,
বুনো জনারের পাতায় রাখো তোমার চিবুকের স্পর্শ,
এ পৃথিবী নির্দিধায় সবকিছুই গ্রহণ করবে।
বজ্রকণ্ঠ ইরসিলা, কেবল তুমিই পান কোরো না রক্তের পেয়ালা,
বজ্রকণ্ঠ ইরসিলা, কেবল তোমারই মধ্যে জন্ম নেবে
যাকিছু আশ্চর্য দ্যুতিময়তা,

সপ্তদশ শতকের এক বীর সৈনিক, যিনি চিলিতে লড়াই করেছিলেন এবং তাঁর সেই বিজয়-কাহিনীর ওপর একখানি মহাকাব্যও রচনা করে গেছেন।

আর সময়ের স্মৃতিমুখ বৃথাই বলতে আসবে :
মিথ্যে, এ সব মিথ্যে।

মিথ্যে স্ফটিক-স্বচ্ছ শাখায় রক্তের দাগ,
মিথ্যে পদ্মার অন্ধকার রাতে গর্বিত সৈনিকের পদপাত,
মিথ্যে নির্দেশনামা
মিথ্যে আহত মানুষের পদসঞ্চার।
সবকিছুই ফিরে আসে পালক-সুসজ্জিত মুকুটের নিস্তব্ধতায়
যেখানে সুদূরের এক সম্রাট ধ্বংস করে দেয় লতাদের।

তুস্যাঁ এল'ওভারতু

নিজের স্নিগ্ধ গন্ধ জড়ানো বিষাদের পাপড়ি
মেলে দিলো হাইতি :
বিস্তীর্ণ করলো বাগিচার পর বাগিচা, সুরম্য প্রাসাদ,
সমুদ্রকে দোলালো
যেমন কোনো কৃষ্ণাঙ্গ প্রপিতামহ
তার এলাকা তার কালো চামড়ার বনেদি গরিমাকে দোলায় অসীম দাপটে।
তুস্যাঁ এল'ওভারতুও

অরণ্য
আর শৃঙ্খলিত সাম্রাজ্যকে গাঁথলো একসাথে,
বেজে উঠলো দ্রিমি দ্রিমি মাদলের একঘেয়ে সুর
আক্রমণের সাংকেতিক ধ্বনি,

পিয়ের ডোমিনিক তুস্যাঁ এল'ওভারতু (১৭৪৬-১৮০৩) হাইতিয়ান ক্রীতদাস, যিনি ১৭৯১ খ্রীষ্টাব্দের গণঅভ্যুত্থানে যোগ দেন এবং ১৭৯৬ খ্রীষ্টাব্দে সান্তো ডোমিনগোর প্রধান সেনাপতি পদে নিযুক্ত হন। পরে দাসপ্রথা পুনঃপ্রবর্তনে ফরাসীদের বিরোধিতা করায় বন্দী হন এবং ফ্রান্সের কারাগারে মারা যান।

বিচ্ছিন্ন পশ্চাৎ অপসরণের পথ,
মাথা তুললো বজ্রনির্ঘোষিত আদেশ—
যথার্থই নির্ভীক সম্রাটের মতো,
যতক্ষণ না তুস'্যা এল'ওভারতু ধরা পড়লো ছায়াচ্ছন্ন জালে
আর ওরা ওকে টেনে হি'চড়ে নিয়ে চললো
সমুদ্র পাড়ি দিয়ে,
পায়ের নিচে থে'তলে
ছুড়ে ফেলে দিলো জাহাজের নিচে
অন্ধকার মৃত্যুর গোপন গুহায়।

অথচ এ দ্বীপে
জবলে উঠলো হাইতির বিশাল পাথরগুলো
কথা কইলো আত্মগোপন করা গাছেরাও
বহে গেলো প্রত্যাশার ঢেউ
মাথা তুললো অরণ্য-প্রাচীর।
সে অরণ্য তোমার আপন স্বাধীনতার,
কৃষ্ণাঙ্গ ভাইয়েরা আমার
ভুলো না তোমাদের সে দুঃসহ যন্ত্রণার স্মৃতি,
পূর্বপুরুষ বীরেরা
অতন্দ্র পাহারা দেবে তোমাদের অলৌকিক সমুদ্র-সফেন।

ক্রিস্টোবাল মিরান্দা

টোকোপিলায় বেলচাচালক

উপসাগরে, বজরার বিস্তৃত পাটাতনে তোমা' সঙ্গে আমার দেখা
ক্রিস্টোবাল, নভেম্বরের আগুন ঝরা দিনে
সোডিয়াম নাইট্রেটের স্রোত যখন এসে মিশছিলো সমুদ্রে।

আজও আমার স্পষ্ট মনে পড়ে
সেই হাস্যোচ্ছল চপলতা, ধাতুর পাহাড়
আর নিশ্চল স্থবির জলরাশি।
বজরার মাঝিমাল্লারা ঘেমে নেয়ে তুষার ঠেলছে,
যন্ত্রণার কাঁধ বেয়ে অন্ধ-জঠর বজরার অতল গহ্বরে
ঝরে পড়ছে নাইট্রেটের তুষার।
সূর্যোদয়ের নায়ক, মৃত্যুর দুর্ভাগ্যের সাথে জড়িত
অ্যাসিডে ক্ষয়ে যাওয়া সারা শরীর
বেলচাচালকরা পাটাতনে ঋজু দাঁড়িয়ে
নিশ্বাসে টেনে নেয় নাইট্রেটের বহমান স্রোত।
ক্রিস্টোবাল, তোমারই জন্যে এই অভিজ্ঞান
অভিজ্ঞান তোমার অন্যসব সঙ্গী বেলচাচালকদের জন্যে,
মারাত্মক গ্যাস
আর অ্যাসিডে আমূল ক্ষতবিক্ষত যাদের বুক,
বিধ্বস্ত ঈগলের একজোড়া পাখার মতো হৃৎপিণ্ড যাদের
ফুলে ফেঁপে ঢোল,
যতক্ষণ না একটা মানুষ মুখ থুবড়ে পড়ে মাটিতে
গড়িয়ে যায় শহরের রাস্তায় রাস্তায়
গড়িয়ে যায় মাঠের প্রান্তে ভাঙা ক্রুশটার দিকে।
ঢের হয়েছে, ক্রিস্টোবাল,
আজ এই এক চিলতে কাগজ স্মরণ রাখছে তোমাকে
তোমাদের সবাইকে, মরুর সন্তান
উপসাগরের মাঝিমাল্লারা
দাঁড় টেনে টেনে রোদে পুড়ে রঙ যাদের কালো হয়ে গেছে।
আমার অপলক চোখদুটো
তোমাদের এই দৈনন্দিন কাজের মধ্যে ঘুরে বেড়ায়
ক্রিস্টোবাল,
আর আমার আত্মা যেন একটা বেলচা
যা ঠিক তোমাদেরই পাশে পাশে পলকে পলকে ওঠায় নামায়
ঝরিয়ে দেয় রক্ত আর তুষার।

বাঁশের আগায় ছিন্নশির

বালবোয়া, মধ্য আমেরিকার সর্বত্র এই সবুজ শ্যামলী প্রান্তরে
তুমি এনেছো মৃত্যু আর হিংস্র থাবা,
আর সেইসব শিকারী পশুদের মাঝে তোমার কুকুর হলো তোমার সত্তা,
বালবোয়া :
রক্তাক্ত চোয়ালে সিংহশাবক
তার পলাতক ক্রীতদাসদের খুঁজে নিয়ে আসে,
তার স্পেনীয় দাঁতগুলো ডুবিয়ে দেয় রুদ্ধশ্বাস মুমূর্ষুর কণ্ঠনালীতে,
মাংসের টুকরোগুলো কুকুরের চোয়াল থেকে
গড়িয়ে পড়ে শহিদের আত্মোৎসর্গে
আর তোমার পকেট ভরে ওঠে স্বর্ণমুদ্রায়।

নিটোল অরণ্যে শিকারী কুকুরের হিংস্র চিৎকার
আর মানুষের ওপর
নামুক অভিশাপ,
অস্ত্র আর দস্যুর সতর্ক নিঃশব্দ পদসঞ্চার।
অভিশাপ নামুক বুনো কাঁটাঝোপের ঘন মুকুটের ওপর,
কেন সে আক্রান্ত দোলনাটাকে আগলে রাখার জন্যে
শজারুর মতো ঝাঁপিয়ে পড়লো না।

অথচ ছুরির নগ্ন আস্ফালন
বিদ্বেষের তিক্ত শাখারা মাথা তুললো
অন্ধকারে
রক্তলোলুপ সেনানায়কদের ঘিরে।
আর তুমি যখন ফিরে গেলে, বালবোয়া,
তোমারই পথে সঙের মতো দাঁড়িয়ে রইল একটা মানুষ

ভাসকো নুনেজ দ্য বালবোয়া (১৪৭৫-১৫১৭) স্প্যানিশ দিগ্বিজয়ী, যিনি প্রশান্ত মহাসাগর আবিষ্কার করেন। প্রথমে নৌ-সেনাধ্যক্ষ, পরে পানামার গভর্ণর পদে তিনি নিযুক্ত থাকেন। পরবর্তীকালে তাঁকে বন্দী এবং শিরশ্ছেদ করা হয়।

নাম যার পেত্রোরিয়াস।

রেড ইণ্ডিয়ানদের ছিঁড়ে খাওয়া
অজস্র কুকুরের আর্ত চিৎকারের মতো ওরা তোমাকে
চারধার থেকে ঘিরে ধরলো।
এখন তুমি মৃত্যুমুখী, শুনতে পাচ্ছো কি
তোমারই উন্মত্ত কুকুরের দাঁতে ছেঁড়া পবিত্র নিস্তব্ধতা ?
এখন তুমি মরতে চলেছো এক নির্মম
নিষ্ঠুর শাসকের হাতে,
তুমি কি অনুভব করতে পারছো
চিরকালের জন্যে হারিয়ে যাওয়া আশ্চর্য এক সাম্রাজ্যের
দুর্লভ স্নিগ্ধ গন্ধ ?

তারপর ওরা বালবোয়ার মাথাটা কেটে
গেঁথে দিলো বাঁশের আগায়।
আর তার মরা চোখদুটো
অনুজ্জ্বল গলিত একদলা কাদার মতো
বাঁশের খুঁটি বেয়ে নেমে এসে
হারিয়ে গেলো মাটির বুকে।

ডিকটেটর

আখের ক্ষেতে রয়ে গেছে এক তীক্ষ্ণ গন্ধ :
রক্ত আর শরীরী মাংসের দলা, তীক্ষ্ণফলা পল্লব যা বয়ে আনে বিবমিষা।
তাল নারকেলের ফাঁকে ফাঁকে নির্বাক মৃত্যু-মর্মরিত
ধ্বংসলীন অস্থিতে কবরগুলো পরিপূর্ণ।
অনন্য ডিকটেটর এখন কথা কইছেন
মাথায় লম্বা রেশমী টুপি, সোনালী কাজকরা ঝালর, উঁচু শক্ত কলার।

ছোট্ট প্রাসাদটা মণিবন্ধনীর মতো ঝিকমিক করে জ্বলছে।
আর দস্তানায় সুসজ্জিত তিনি,
কখনো কখনো বারান্দাটা পেরিয়ে যাবার সময়
তীব্র রলোরোল এসে মেশে মৃত কণ্ঠস্বরে,
নীলাভ মুখগুলো তখন মনে হয় যেন সদ্য সমাহিত।
অথচ কান্না দেখা যায় না কোথাও, এ যেন ঠিক অদৃশ্য কোনো উদ্ভিদ
যার অন্তহীন বীজগুলো কেবল ঝরে পড়ে মাটির বুকে
যার অন্ধ বিশাল পাতাগুলো আলো ছাড়াই অসম্ভব বেড়ে ওঠে।
আঘাতে আঘাতে
ক্লেদাক্ত, নৈঃশব্দ্য ভরা পল্বলের বীভৎস জলে
পরতে পরতে জমে ওঠে ঘৃণা।

রাস্তায় বন্ধুরা

তারপর কুয়াশা আর বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে আমি
এসে পেঁছিলাম রাজধানীতে।
এগুলো কোন রাস্তা ?
১৯২১-এর পোশাকে আমার গ্যাস, ইঁট আর কফির বিশ্রী গন্ধ।
কিছু না বুঝেই সহপাঠীদের মধ্যে আমি হেঁটে যাই
আমার চারদিকে টেনে দিই কঠিন প্রাচীর,
প্রতিদিন প্রতিদিনই আমার রিক্ত কবিতায় খুঁজি
পল্লবিত শাখা, বড় বড় বৃষ্টির ফোঁটা আর সেই হারানো চাঁদ।
অসহায় আমি কবিতার সেই গভীর সত্তায় ডুবে যাই
সারাক্ষণ প্রতিটা সন্ধ্যায় আমি তার অতল গহনে তলিয়ে যাই
আঁকড়ে ধরতে চাই অমিত উদ্যম
অথচ স্পর্শ পাই না কোথাও,
নিঃসঙ্গ সমুদ্রের গাঙচিলেরা উধাও
যতক্ষণ না আমি বন্ধ করি চোখের পাতা আর আমারই

কবিতাটিতে নেরুদা সান্টিয়াগোয় তাঁর স্কুলজীবনের কথা বলেছেন। কবির বয়েস তখন সতেরো।

শরীরী সত্তার গভীরে ঘটে যায় মগ্ন ভরাডুবি।
তাহলে কি এসবই ছায়া,
মাটি থেকে জেগে ওঠা
সে কি শুধু অদৃশ্য আর্দ্র সজল পাতা ?
কোন সে আহত সম্পদ যার থেকে মৃত্যু অবিরাম ঝরে পড়ে
যতক্ষণ না সে স্পর্শ করে আমার হাত, আমার পায়ের পাতা,
নিয়ন্ত্রিত করে আমার হাসি
আর রাস্তার মাঝে খুঁড়ে তোলে যন্ত্রণার অতল গহ্বর ?

আমি জীবনে প্রবেশ করি, বেড়ে উঠি, পোড়খাওয়া মানুষ
বীভৎস অন্ধকার গলির মধ্যে দিয়ে হেঁটে যাই
দুঃখবোধহীন, প্রলাপের মধ্যেও গেয়ে উঠি সীমান্তের গান।
দেওয়ালে সারি সারি মুখ
চোখগুলো তাকায় না আলোর দিকে, শৃঙ্খল জলের রেখা
নিঃসঙ্গ অহংকার, অন্যায় অপরাধে দীপ্ত জ্বলে ওঠে,
ঘৃণ্য ছিন্ন হৃদ্‌পিণ্ডে পূর্ণ হয় অতলতা।
ওদেরই সঙ্গে আমি হেঁটে যাই : সে কেবল ঐকতানে
যা আমার কন্ঠস্বর খুঁজে পায় আদিম নির্জনতা।

অবশেষে আমি প্রকৃত মানুষ হয়ে উঠি
আগুনের লেলিহান শিখার মধ্যে গান গাই, পছন্দ করে
বন্ধুরাও, যারা রাত্রির অন্ধকারে
খুঁজে নেয় তাদের মাথা গোঁজার ঠাঁই
যারা সরাইখানায় একদিন আমার সঙ্গে গান গেয়েছিলো
যারা আমাকে দিয়েছিলো একক অন্তরঙ্গতার চেয়ে বেশি কিছু.
সংগ্রামী হাতে ওরা আড়াল করে রেখেছিলো
এমন কিছু
যা একটি বসন্তের চেয়েও দুর্লভ,
অজ্ঞাত একটি অগ্নিশিখা, শহরের প্রান্তসীমায়
ক্রমশঃ বিলীয়মান অঞ্চলের সেই সহজাত পল্লবরাজি।

প্রহেলিকা

তুমি আমাকে জিগেস করেছো ওখানে কোন গালদাচিংড়ি তার সোনালী
পা নিয়ে ভেসে বেড়ায় ?
তার উত্তরে আমি বলি, সমুদ্র সব জানে।
তুমি বলো, কোন অ্যাসিডিয়া তার স্বচ্ছ আবরণে অপেক্ষা করে,
কিসের জন্যেই বা অপেক্ষা করে ?
আমি বলি, তোমারই মতো সময়ের জন্যে সে অপেক্ষা করে থাকে।
তুমি আমাকে জিগেস করো ম্যাক্রোকাসটিক-আলগা কাকে তার বাহুতে
ঝুলিয়ে রাখে ?
আমি বলি পড়াশোনা করো, ভালো করে পড়াশোনা করো
তাহলেই সব জানতে পারবে,
কোনো এক সময়ে, বিশেষ এক সমুদ্রে
আমি যা জানতে পেরেছি।
তুমি আমাকে প্রশ্ন করো অতিকায় তিমির শিকারীদাঁত সম্পর্কে
আর তার উত্তরে বর্ণনা দিয়ে বলি
কেমন করে সমুদ্র-দানবটা তীক্ষ্ন হার্পুনে বিদ্ধ হয়ে মারা গেলো।
দক্ষিণের স্রোতে সচ্ছল বসন্তে
কেঁপে যাওয়া মাছরাঙার পালক সম্পর্কে
তুমি আমার কাছে জানতে চাও,
কিংবা সামুদ্রিক ফুলের স্ফটিকস্বচ্ছ স্থাপত্য ছুঁয়ে যাওয়া
নতুন কোনো প্রশ্ন দেখতে পেলে কোনো চিঠিতে,
তুমি কি এ প্রসঙ্গে
এখন আমার সঙ্গে আলাপ করবে ?
তুমি কি বুঝতে চাও সমুদ্র-সত্তার তড়িৎ-স্বভাব ?
অদৃশ্য জলকণায় জমাট হিমেল ফেনা যা হাঁটলেই ভেঙে যায় ?
জলের গহন অতলে ছড়িয়ে পড়া সংগীতের সুরমূর্ছনা ?

আমি তোমাকে বলতে চাই সমুদ্র সব জানে,
জানে মণিময় বিস্তীর্ণ জীবন বালুরাশির মতো অন্তহীন, অম্লান

গোনা যায় না এত অসংখ্য,
রক্তবর্ণ আঙুরগুচ্ছের মাঝে সমগ্র
পাপড়িটাকে গড়ে তোলে উজ্জ্বল কাঠিন,
আর উন্মোচিত-গ্রন্থি জেলিমাছগুলোকে আলোকে পরিপূর্ণ,
এবং রামধনু-রাঙা অসংখ্য গর্ভিণী ঝিনুকে তৈরী প্রাচুর্যের শিঙা থেকে
ছড়িয়ে পড়া সংগীতময় তন্তুরাজি।

আমি এক শূন্য জাল ছাড়া আর কিছুই নই
যা অনেক আগেই মানুষের দৃষ্টির বাইরে চলে গেছে
মৃত্যুলীন গহন অন্ধকারে,
যা কমলাকৃতি ভীরু এ ভূমন্ডলে ত্রিভুজ আর দ্রাঘিমার সঙ্গে পরিচিত সীমানার
অনেক অনেক বাইরে চলে গেছে।

তোমার মতো আমিও হেঁটে বেড়াই
অসীম নক্ষত্রের খোঁজে
এবং রাত্রে আমার জালের মধ্যে আমি নগ্ন জেগে উঠি,
কেবল যে জিনিসটা ধরা পড়ে, হাওয়ার ফাঁদে জড়ানো একটা মাছ।

দি ইউনাইটেড ফ্রুট কম্পানি

যখন বেজে ওঠে শিঙাধ্বনি
এ পৃথিবীর সবকিছুই তখন মনে হয় প্রস্তুত।
ঈশ্বর পৃথিবীটাকে টুকরো টুকরো করে পাঠিয়ে দিলেন
কোকা কোলা, আনাকোন্দা
ফোর্ড মোটর আর অন্য সব কম্পানির নামে :
ইউনাইটেড ফ্রুট কম্পানি
নিজের জন্যে সুসংরক্ষিত করে রেখেছে সবচেয়ে উর্বর আমার স্বদেশভূমির
মধ্য সমুদ্রতট,

আমেরিকার অনন্য তনু।
এই অঞ্চলগুলোর নাম রাখা হয়েছে
'ব্যানানা রিপাবলিক'
এবং যারা মুক্তি, স্বাধীনতা আর রক্ত-নিশানকে বয়ে এনেছে
সেইসব অক্লান্ত নায়ক, ঘুমন্ত মৃতদেহের ওপর
গড়ে তোলা হয়েছে প্রহসনের পালা :
স্বাধীনতাকে পায়ের নিচে লুটিয়ে
উপহার দেওয়া হয়েছে সীজারের রত্নমুকুট,
ছড়ানো হয়েছে নগ্ন বিদ্বেষ,
প্রলুব্ধ করা হয়েছে মাছিদের একনায়কতন্ত্র—
ট্রুজিলো মাছি,
তাকো মাছি,
ক্যারিয়াস মাছি,
মাঁতিনেজ মাছি,
উবিকো মাছি,
বিনীত রক্তের সোঁদা মাছি,
মারম্যালেডে তৈরি আবর্জনার মাছি,
কবরখানার আশেপাশে ভনভনে মাতাল মাছি,
সার্কাস মাছি,
নিপুণ স্বেচ্ছাচারিতায় রপ্ত বিজ্ঞ মাছি।

রক্তচোষা মাছিদের মাঝে
নোঙর ফেলে ইউনাইটেড ফ্রুট কম্পানির জাহাজ,
অতল গহ্বর পূর্ণ করে নিয়ে যায়
কফি আর ফল
আমাদের নিমজ্জিত ভূখণ্ডের যা কিছু অনন্য সম্পদ।

এদিকে রেড ইণ্ডিয়ান শ্রমিকরা
বন্দরে চিনির গর্তে ডুবে যায়
ভোরের কুয়াশা জড়িয়ে প্রস্তুত হয় কবরখানার জন্যে :

পুড়িয়ে যাচ্ছে একটা নিষ্প্রাণ মৃত দেহ
নামহীন জড়পিণ্ডের মতো
ওপড়ানো সাইফার
কিংবা আবর্জনার স্তূপে ছুঁড়ে ফেলা
একগুচ্ছ মৃত নষ্ট ফলের মতো।

আমি চাই সবার জন্যে

আমি চাই সবার জন্যে এ পৃথিবী মাটি আগুন রুটি চিনি গম সমুদ্র আর বই।
তাই গৃহহীন যাযাবরের মতো আমি ঘুরে বেড়াই।
বিশ্বাসঘাতকদের বিচারকরা শিকারী হায়নার মতো আমাকে খুঁজে ফেরে
আর তাদের পশুগুলো পোষা বাঁদরের মতো নখে নখে ক্ষতবিক্ষত করে
আমার নাম

বিস্মৃত নিশান্তিকার বিস্তীর্ণ মরুতে
খনির প্রবেশ পথে, যে ছিলো প্রধান, আমি ছিলাম তার সাথে
আর আমার নির্যাতিত ভাইয়ের সঙ্গে আমিও চিৎকার করে বলেছিলাম
'তোমাকে আর কোনোদিন এমন জীর্ণ ছিন্নবাস পরতে হবে না
তোমাকে আর কোনোদিন এমন রুটিবিহীন দিনগুলো দেখতে হবে না
দেশের প্রকৃত সন্তান, একদিন তোমরা ঠিকই মাথা তুলে দাঁড়াবে
এবং সেদিন আমরা ভাগ করে নেবো অরণ্যের যাকিছু পবিত্র বিস্ময়,
তার ললিত লাবণ্য
এবং মায়েদের চোখ আর কোনোদিনই অশ্রুসজল হবে না তার শিশুদের জন্যে।

অথচ উজ্জ্বল ভালোবাসার পরিবর্তে, রাত্রে
ক্ষুধা আর শহিদের রক্তে ওরা যখন মানুষকে উপেক্ষা করে—
একজন মানুষ যে বিশ্বাস করে নিজেদের অঙ্গীকার, যে ফিরে পাবে
গাছের গুঁড়ির মতো তার শক্তির অমিত সঞ্চয় আর ভালোবাসা,

তাই আমি কোনোদিনই ছিলাম না তুচ্ছ পুতুলদের সাথে
ছিলাম নামহীন আমার অগণন দেশের মানুষের সাথে।

আমার দেশের মানুষের জন্যে চাই অনন্য একটা দেশ
আমি চাই আমার দেশের কুন্তলের প্রতিটা ভাঁজে ভাঁজে জড়ানো থাক সেই আশ্চর্য দিন।
আমি চাই আলোকের ভালোবাসা, লাঙলের ফলার নিটোল ভালোবাসা
আর যারা ছিনিয়ে নেয় মানুষের মুখের গ্রাস
আমি চাই নিঃশেষে মুছে দিতে
ঘৃণায় ঘৃণায় আঁকা ওদের প্রতিটি রেখা।

স্পেনের কারাগারে নিহত মিগুয়েল হেরনানদেজকে

সোজা পুবপ্রান্ত থেকে তুমি আমার কাছে এসেছিলে.
হে কালের রাখাল, তুমি আমার জন্যে এনেছিলে
কর্ষিত ক্ষেতের পবিত্রতা,
পুরাণের ন্যায়তত্ত্ব, ফ্রাই লুইসের মন-মাতানো গন্ধ.
প্রস্ফুটিত কমলার ফুল, পাহাড়ে পাহাড়ে
জ্বলন্ত ঘুঁটে. আর তোমার মুখোসে
সংগৃহীত ফসলের তীক্ষ্ম আবেশ।
আর তোমার মধুময় চোখ
যা সারা বিশ্বকে উদ্ভাসিত করে তুললো।

তুমি তোমার কণ্ঠে এনেছিলে নাইটেঙ্গেল।
ছোপ-ছোপ কমলা রঙের এক নাইটেঙ্গেল,
এক পবিত্র সুরের বাহার. পল্লবিত এক শক্তির অধিকার।
হে আত্মজ আমার, আলোকপুঞ্জে ছিটিয়ে দিলে রাশি রাশি বারুদ,

রাইফেল আর রাইফেল হাতে নিয়ে
চন্দ্র-সূর্য মাথায় করে তুলে চলে গেলে লড়াইয়ের ময়দানে।

তুমি তো জান, হে আমার আত্মজ, যা কিছু
ছিলো তোমার সাধ্যের অতীত, তা এখন আমার
অধিকারে, কাব্যের সমগ্র সত্তায় তুমি ছিলে
নীল অগ্নিশিখা। আজকে আমি উদ্ভিন্ন
মাটির বুকে কান পাতি
তোমারই কণ্ঠস্বর শুনবো বলে।
শুনি তোমার কণ্ঠস্বর · রক্তে, গানে, মৌচাকের মৃমর্মরতায়।
তোমার জাতির চেয়ে দীপ্ত আমি আর দেখিনি,
দেখিনি মাটির গভীরে এতো দৃঢ় শিকড়, না কোনো
সৈনিকের হাতও না।
তোমার হৃদয়ের মতো এত প্রাণবন্ত
আমি আর কিছুই দেখিনি
আমারই লোহিত পতাকায় পতাকায় যেন সৃষ্টিমুখর প্রাণোচ্ছল হৃদয়!

চিরকালের তারুণ্যে উদ্ভাসিত তুমি, দীর্ঘ অতীতের
হে স্বাধীন বিদ্রোহী মানুষ,
মুক্তোর মতো গমের দানায় দানায় আর বসন্তের উচ্ছল ধারায়
নিহিত ধাতুর মতো বিন্যস্ত আর ঘন-কালো অন্ধকার,
কোনো বিশ্বাস্য মুহূর্তে তোমার সঙ্গীন কথা বলে উঠবে।

তোমার মৃত্যুর পর থেকে আমি
তাদেরই একজন, যারা তোমার সন্ধানে ঘুরে ঘুরে ফিরছে;
আমি তাদেরই একজন
যারা একদিন তোমার মৃত্যুর কৈফিয়ত নিতে আসবে,
তাদেরই মধ্যে তুমি চিনতে পারবে আমার পায়ের ধ্বনি
যখন তারা মরণ-পণে ঝাঁপিয়ে পড়বে কেয়নকে ধ্বংস করতে
স্পেনের বুকে, যাতে মৃত-মানুষের মুখগুলো

আবার আমরা ফিরে পাই।

যারা তোমাকে হত্যা করেছে, তারা জানুক
একদিন এর দাম রক্ত দিয়েই শুধতে হবে,
যারা তোমাকে যন্ত্রণায় বিদ্ধ করেছে, তারা জানুক
একদিন তাদের আমার মুখোমুখি দাঁড়াতে হবে।

বেইমানরা জানুক, আজ যারা তোমার নাম
পুঁথির পাতায় টোকে, সেই সব দামাসস আর গেরার্দ'স
জহ্লাদের সেই সব হৃদয়হীন নীরব সাকরেদরা
ওরা জানুক, তোমার অবিস্মরণীয় আত্মত্যাগ
তোমার মৃত্যু যেন ওদের ভীরুতার এক ঘন-ঘোর আঁধিয়ার।

আর যারা ওই বাসি লরেলে সজ্জিত হয়ে
তোমাকে আমেরিকার মাটিতে পা রাখতে দিলো না,
ছড়াতে দিলো না তোমার ঊর্মিমুখর মুকুটের রক্তাভ জ্যোতি,
ওদের অবজ্ঞায়, ওদের অবহেলায় আমার হাতে
অধিষ্ঠিত করো কারণ ওরা তোমার অনুপস্থিতে
চেয়েছিলো আমাকে চিরতরে স্তব্ধ করে দিতে।

মিগুয়েল, ওসুনা কারাগার থেকে দূরে
নির্মমতা থেকে দূরে
মাও সে-তুঙ নেতৃত্ব দেন তোমার বিধ্বস্ত কবিতা
আমাদের বিজয় অভিযানে।
আর গুঞ্জরিত প্রাগ
রচনা করে চলেছে তোমার গানের সেই দুর্লভ মধুচক্র,
চিরসবুজ হাঙ্গারি ফসল তোলার নাচে গানে
মুখর করে রেখেছে জগরী নদীর দুকূল,
আর বিমান আক্রমণের নগ্ন সংকেতেও ওয়ারস
তার পুনর্নির্মাণের স্ফটিকস্বচ্ছ তরবারিটাকে তুলে ধরেছে ঊর্ধ্বে।

অমিত শক্তি নিয়ে জেগে উঠেছে বিশাল পৃথিবী,
তোমার গানের মর্তলোক আর তোমার দেশের
নিরাপত্তার জন্যে সঞ্চিত ছিলো যে ইস্পাত, আজ তা
স্তালিন আর তাঁর উত্তরপুরুষদের দৃঢ় প্রত্যয়ে হয়েছে নিরাপদ।
ইতিমধ্যেই আলো
ছড়িয়ে পড়েছে তোমার বিশ্রামের আবাসভূমিতে।

স্পেনের মিগুয়েল, বিধ্বস্ত দেশের নক্ষত্র,
তোমাকে আমি কেমন করে ভুলবো, আত্মজ আমার,
তোমাকে আমি কোনোদিনও ভুলতে পারি না!
তোমারই মৃত্যুতে
আমি জীবনকে চিনলাম, আমার চোখে নেমেছিলো শোকের ছায়া,
অথচ তার মধ্যে এক ফোঁটাও অশ্রু ছিলো না।
ছিলো সব আমোঘ অস্ত্র।
তার জন্যে তুমি অপেক্ষা করো। অপেক্ষা করো আমার জন্যে মিগুয়েল!

মিগুয়েল ওতারো সিলভাকে লেখা চিঠি

নিকোলাস গ্যিলেন তোমার চিঠিটা আমাকে পৌঁছে দিলো।
অদৃশ্যভাবে লেখা, তার পোশাকে, তার চোখের তারায়।
কতই না উচ্ছল তুমি, মিগুয়েল, আমরা দুজনেই!
প্রায় মিলিয়ে আসা দগদগে গভীরক্ষত এ পৃথিবীতে
উদ্দেশ্যবিহীন ভাবে আজ কেউই আশ্চর্য সুখী নয়,
কেবল আমরা ছাড়া,
আমি কাকটাকে উড়ে যেতে দেখি
ও এখন আর কিছুই করতে পারে না।
তুমি লক্ষ্য রাখো কাঁকড়া বিছেটাকে
আর ঘষে মেজে ঝকঝকে করে তোলো তোমার গিটার।

আমরা কবিতা লিখি, বুনো জন্তু জানোয়ারদের মধ্যে বাস করি,
যখন কোনো মানুষকে স্পর্শ করি, আমরা বিশ্বাস করি
তার স্থবিরতা গলা মাংসের মতো টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে পড়ে।
এখন তুমি ভেনিজুয়েলায়
সম্মিলিতভাবে মানুষকে যতটুকু বাঁচানো সম্ভব বাঁচাও,
আর আমি আমার স্তব্ধ করপুটে ঘিরে রাখি জীবনের জ্বলন্ত অঙ্গার।
কত না উচ্ছল সুখ, মিগুয়েল!
তুমি কি জিগেস করবে আমি কোথায়?
রাষ্ট্রের প্রয়োজনে যতটুকু সম্ভব বিবরণ দিয়ে শুধু বলবো—
উপল সমাকীর্ণ এ এক বিস্তীর্ণ সৈকত
যেখানে এক হয়ে মিশেছে সমুদ্র আর প্রান্তর, ঢেউ আর পাইন.
গাঙচিল আর ঈগল, প্রান্তর আর ফেনা।
তুমি কি কখনও সারাদিন সামুদ্রিক পাখিদের সঙ্গে কাটিয়েছো
কেমন করে ওরা উড়ে বেড়ায় লক্ষ্য করে?
ওরা যেন এ পৃথিবীর যাবতীয় চিঠি বয়ে নিয়ে যায় নির্দিষ্ট গন্তব্যে।
সারসেরা পালতোলা জাহাজের মতো ছুটে যায়,
অন্য পাখিরা তীরের মতো ওড়ে
যেন পান্নার মতো নীল আন্দিয়ান পাহাড়ি বেলায় জলমগ্ন সম্রাটের
মৃত্যুসংবাদ বয়ে নিয়ে চলেছে কোনো রাজপ্রতিনিধি,
আর গাঙচিলের এমন আশ্চর্য ধবল, প্রতিনিয়তই ভুলে যাচ্ছে
কি যেন তাদের বলার ছিলো।
যখন আমরা ভালোবাসতে শুরু করি আর তার জন্যে সংগ্রাম করি
আকাশের মতো জীবন তখন কি স্বচ্ছ মনে হয়, মিগুয়েল!
শব্দ সে তো মদ আর রুটি,
কেননা আমরা যখন কবিতা আর বন্দুক হাতে নিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ি
ওরা তখন ভেবেই পায় না আমাদের নিয়ে কি করবে,
মিগুয়েল!
মেরে ফেলা ছাড়া আর কিইবা করতে পারে,
কিন্তু সেটা আদৌ শোভন হবে না—
এ যেন রাস্তার ধারের কোনো ঘর

সস্তায় ভাড়া দেওয়া ছাড়া কিছুই নয়,
ওরা বড়জোর আমাদের অনুসরণ করতে পারে, মিগুয়েল,
তবু যদি শিখতে পারে আমাদের মতো হাসতে, আমাদের মতো কাঁদতে।
আমি যখন প্রেমের কবিতা লিখি, যা আমার সত্তার গভীর থেকে
উৎসধারার মতো চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে,
যখন আমি নির্জন নিঃসঙ্গ যন্ত্রণায়
উন্মত্ত আর্তনাদ করে উঠি, ওরা আমাকে বলে :
'আপনি কি মহান, চারণ কবি থিওক্রিটাস্।'
থিওক্রিটাস্ আমি নই,
জীবনকে আমি গ্রহণ করেছি,
তার মুখোমুখি দাঁড়িয়েছি, তাকে চুম্বন করেছি, তাকে জয় করেছি,
তারপর হেঁটে গেছি খনির গহ্বরে,
দেখেছি অন্য মানুষ কেমন করে কাটায় জীবন।
যখন বেরিয়ে এসেছি, হাতদুটো আমার ভিজে গেছে নোংরা আবর্জনা
আর বিষণ্নতায়,
হাতদুটো মেলে দিয়ে সেনানীদের ডেকে বলেছি :
'আমি এ পাপের সাথে সম্পৃক্ত নই।'
ওরা বিরক্ত হয়েছে, কেশেছে, উপেক্ষা করে চলে গেছে,
থিওক্রিটাস্ বলা ছেড়ে দিয়ে বিদ্রূপ করেছে, তারপর আমাকে
গ্রেফতার করার জন্যে
লেলিয়ে দিয়েছে সমগ্র বাহিনীকে, যেহেতু আমি
কেবলমাত্র অলৌকিক বিষয়ে নিজেকে জড়িয়ে রাখতে চাইনি।
অথচ আনন্দকে আমি খুঁজে পেয়েছি নিজেই।
তারপর থেকেই সমুদ্র-পাখিদের বয়ে আনা
সুদূরের সজল চিঠিগুলো আমি পড়তে শুরু করি,
দৃঢ় আত্মবিশ্বাসে ধীরে ধীরে একের পর এক সে সংবাদ তর্জমা করি :
এ কাজে আশ্চর্য নিপুণ কারিগরের মতো আমি এক সময়নিষ্ঠ শিল্পী।
সহসা জানলার কাছে ছুটে যাই। পবিত্র আলোর
স্বাদ আর রুক্ষ পাহাড়ের ফ্রেমে বাঁধানো এক টুকরো স্বচ্ছ আকাশ,
এবং যাকিছু ভালোবাসি : ঊর্মিমালা, শিলারাশি,

আর সামুদ্রিক প্রবাল কীট—
এরই মধ্যে আমি কাজ করে যাই উন্মাদ আনন্দে।
অথচ আমরা সত্যিই সুখী কিনা তাতে কারুর কিছু এসে যায় না,
ওরা তোমাকে সবচেয়ে সুন্দর ভূমিকাটাই দিয়েছে :
'এখন অতিরঞ্জিত কিছু করো না, কিংবা ভেবো না।'
ওরা যেন আমাকে ঝিঁঝির খাঁচায় বন্দী করে রাখতে চায়,
যেখানে কান্না ঝরবে, আমি ডুবে যাবো আর ওরা আমার সমাধির ওপর
ভাষণ দেবে।
সেই দিনটা আমার স্পষ্ট মনে পড়ে
খনি-বস্তির বিস্তীর্ণ বালুপ্রান্তরে চলেছে পাঁচশো শ্রমিকের ধর্মঘট।
তারাপাকার এক আগুন-ঝরা বিকেল।
এবং মরুভূমির উত্তপ্ত বালি, রক্তহীন বিশুষ্ক সূর্য
মুখগুলো শুষে নেবার পর আমি দেখলাম, ঘৃণ্য পেয়ালার মতো
আবার ফিরে আসছে আমার সেই পুরানো হতাশা।
এই সংকটের মুহূর্তে, লবণবস্তির দারুণ দুঃখের দিনে,
সংগ্রামের সেই দুর্বল মুহূর্তে
যখন আমাদের পরাজিত হবার সম্ভাবনা ছিলো কম নয়,
খনিবস্তি থেকে এলো ম্লান ছোট্ট একটা মেয়ে,
দুঃসাহসী কণ্ঠে সে আবৃত্তি করলে তোমারই একটা কবিতা
কণ্ঠস্বরে তার লুকানো ছিলো কাচ আর ইস্পাতের জাদু,
তোমারই একটা পুরানো কবিতা যা ঘুরে গেলো আমার দেশ
লাতিন আমেরিকার প্রতিটি শ্রমিকের
কুঁকড়ে যাওয়া চোখের তারায়।
সহসা তোমার ছোট্ট কবিতাটা আরক্ত কোরকের মতো
জ্বলে উঠলো আমার মুখে,
এবং উচ্ছল এক আনন্দ অনুভূতি ছড়িয়ে পড়লো আমার রক্তের প্রতিটি শিরায়।
মনে পড়লো তোমার কথা,
তোমার তিক্ত ভেনিজুয়েলার কথাও।
কয়েক বছর আগে
পায়ে শৃঙ্খলের ক্ষতচিহ্ন আঁকা এক ছাত্রকে দেখেছিলাম,

সে আমাকে শৃঙ্খলিত সড়ক-কয়েদীদের কথা বলেছিলো
বলেছিলো গারদখানাগুলোর কথা, যেখানে মানুষ গেলে
চিরদিনের মতো উধাও হয়ে যায়, আর কখনও ফেরে না,
কেননা এই-ই আমাদের আমেরিকার প্রকৃত রূপ।
দীর্ঘ বিস্তীর্ণ উদ্দাম নদীমালা আর প্রজাপতিদের নক্ষত্রপুঞ্জ
(কোথাও কোথাও পান্নাগুলো আপেলের মতো ভারি)
অথচ নদী আর রাত্রির সারাটা দৈর্ঘ্য জুড়ে

রক্তাক্ত পদক্ষেপ,
কখনও তেলের খনির কাছে, কখনও বা পিসাগুয়ায়
নাইট্রেট কারখানার আশেপাশে, যেখানে গলিত এক নষ্ট শাসক
আমাদের সবচেয়ে ভালো লোকটিকে জ্যান্ত কবর দিচ্ছে,
যাতে তার অস্থিগুলোকে অনায়াসেই বিক্রি করা যায়।
তাই তুমি কবিতা লেখো
যাতে অপমানিত আহত আমেরিকা
আবার তার প্রজাপতিগুলোকে নির্ভয়ে আকাশে ওড়াতে পারে
এবং সঞ্চয় করতে পারে তার দুর্লভ
চুনী পান্না,
যাতে ব্যবসায়ী শয়তান, ঘাতকের জমাটবাঁধা রক্তকলঙ্কিত হাত
আর ঝরাতে না পারে অজস্র রক্তপাত।
ধরে নিচ্ছি ওরিনোকোয় থাকাকালীন সময়টুকুতে
কবিতা লিখে দারুণ আনন্দ পাচ্ছো, হয়ত বাড়ির জন্যে সামান্য কিছু
মদও কিনে ফেলেছো,
কেননা এ যুগের কবিদের মতো বলিষ্ঠ কাঁধে
তুমিও অংশ নিয়েছো যুদ্ধে ও জীবনে—
হালকা পোশাকে হেঁটে গেছো দীর্ঘ পথ।
সেইদিন থেকে আমি তোমাকে লিখতে চেয়েছি
এবং গ্যিলেন যখন তোমার খবর নিয়ে এলো,
যা তার সারাটা পোশাক থেকে উপছে পড়ছিলো
আমারই বাড়ির বাদাম গাছের নিচে,
আমি স্বগতস্বরে বললাম, 'এবার!'

তবু তা সত্ত্বেও চিঠিটা আমি শুরু করতেই পারিনি।
অথচ আজ আমার কাছে দিনটা দারুণ :
শুধু একটাই নয়
হাজারো গাঙচিল আমার জানলা অতিক্রম করে চলে গেলো
এবং ওদের হারিয়ে ফেলার আগে,
পৃথিবীর সব সৈকত থেকে বয়ে আনা ওদের চিঠিগুলো
কেউ পড়ার আগেই
আমি তুলে নিলাম।
ওই চিঠিগুলোর প্রত্যেকটিতে আমি পডলাম তোমাবই লেখা
যে লেখা আমি লিখি, স্বপ্ন দেখি, এবং কবিতায় ভরিয়ে তুলি,
তাই ভেবেছি এই চিঠিটাই তোমাকে পাঠাবো, যেটা এই মাত্র এখানে শেষ কবলাম,
যাতে এই জানলা দিয়ে আমাদেব পৃথিবীকে আবও স্পষ্ট দেখতে পারি।

হাওয়ার্ড ফাস্টকে

আমি তোমার সঙ্গে কথা বলছি হাওযার্ড ফাস্ট,
তুমি এখন কারাগারে।
আমি তোমাকে আলিঙ্গন করছি, অন্তরঙ্গ সাথী আমার,
ভাই আমার, আমি তোমাকে সুপ্রভাত জানাচ্ছি।

আমি দেখেছি স্পেনেব রুদ্ধদ্বার, দেখেছি স্পেনেরই আলোয় অভিষিক্ত
এক কবিকে
যার মাথাটা এখন গড়াচ্ছে অন্ধকার ছায়ায়,
আর রক্তলোলুপ পশুরা ঝুঁকে রয়েছে তার ওপর।
সেদিন থেকেই স্পেনের বুকে নেমে এসেছে রাত্রি আর অন্ধকার,
রক্ত আর চোখেব জল।
এদেশের আমি কেউ নই।
আমি এসেছি সুদূর চিলি থেকে।

সেখানে রয়েছে আমার সঙ্গীসাথী, বই আর সুন্দর একটা বাড়ি,
যারা প্রশান্ত মহাসাগরের হিমেল উত্তাল তরঙ্গমালার দিকে অপলক চোখে তাকিয়ে
রয়েছে
স্পেনের শাসকশ্রেণীর অভিলাষে ওরা আমাকেও জেলে পুরবে,
খুন করবে, কিংবা চিরদিনের মতো স্তব্ধ করে দেবে।

ফ্রাংকো, ট্রুমান, ট্রুজিলো ; ওরা সবাই মানুষের কণ্ঠস্বরকে ঘৃণা করে।
অথচ সব মানুষকে বন্দী করার আগে
সব মানুষকে ভীতসন্ত্রস্ত করে তোলার আগে
ওরা লেখক আর গায়কদের ওপর আঘাত হানে।
ফ্রাংকোর গলাবন্ধে রক্তের দাগ,
ট্রুজিলো শানিয়ে রেখেছে তার তরবারি
আর ট্রুমান আমেরিকার সবচেয়ে সেরা চিন্তানায়কদের
জেলে পুরে গর্জন করে বেড়াচ্ছে।
কে জানে প্যারাগুয়ের দুঃখের খবর ?
এরেকুউপায় মৃত তরুণদের
দুর্দমনীয় লাল রক্তস্রোতে প্লাবিত যে সংগ্রামের ভূমি
কারা পেয়েছে সেই তিক্ত রক্তের স্বাদ ?
বলিভিয়ায়, আকাশ-ছোঁয়া টিনের পিরামিডের নিচে
ওরা খনি-শ্রমিকদের গুলি করে মেরেছে,
যারা মাটির নিচে থেকে তুলে এনেছে ভাল ভাল টিন,
যাদের হাতগুলো এখন শূন্য রিক্ত।
ভেনিজুয়েলায়, বিস্মৃতির অতল সমুদ্র থেকে আবার উঠে এসেছে
পায়ের বেড়ি, হাতের শৃঙ্খল।
কলম্বিয়ায় ওরা নিঃশব্দে ধ্বংস করেছে
মানুষের উত্তাল দুর্বার প্রবাহকে।
আর চিলিতে *
নির্যাতিত মানুষের মাথার ওপরে ঝুলছে মরুভূমির অভিশপ্ত প্রেত-চাঁদ।

কিন্তু মানুষকে মারার এই যে নারকীয় অনুষ্ঠান

আজ আর তা গভীর অরণ্য বা দক্ষিণ আমেরিকার
বিস্তীর্ণ অজানা প্রান্তরেই ছড়িয়ে পড়েনি,
ছড়িয়ে পড়েছে ধনীর উদ্ধত প্রাসাদে,
সোনালী আলোয় উদ্ভাসিত উত্তরের নানান প্রান্তরে,
কলকারখানা সুসংলগ্ন দুর্গে
যেখানে 'স্বাধীনতার প্রতিমূর্তি'র অগ্নিমশাল
আলোকিত করছে বন্দীশালার পথ।

হাওয়ার্ড ফাস্ট, তুমি এখন কারাগারে বন্দী।
তোমার বই দাউ দাউ বহ্নিশিখার মতো একের পর এক
উদ্ভাসিত করে তুলেছে আমেরিকার জনজীবন।
তুমি লিখেছো বীর নিগ্রোদের কথা,
সেনাধ্যক্ষ আর গরীবদের কথা,
শহর আর স্বাধীনতার কথা।
আজ তুমি গৌরবান্বিত বন্ধুদের সাথে কারাগারে বন্দী,
আর তোমার মাথার ওপরে ঝরে পড়েছে সেই একই গাঢ় তুষার
একদিন যা ঝরে পড়তে দেখেছি স্পেনের বুকে,
সেই একই রাত্রি, একই ছায়া, একই রক্ত।

হে আমার স্বদেশভূমি, নগ্ন আর বিশাল,
হে আমার তারুণ্যের দীপ্ত অভিজ্ঞান,
পৃথিবীকে রাশি রাশি উপহার দেবে বলে
গমের ক্ষেতে দাঁড়ানো কৃষাণের মতো তুমি স্পন্দিত হয়ে ওঠো!

স্বচ্ছ স্ফটিকের মতো উত্তর আমেরিকা, আজ তুমি নিজেকে হঠাৎ
দুর্গন্ধময় আবর্জনার স্তূপে পরিণত করেছো,
লুব্ধ পশুর মতো গ্রাস করেছো অন্যকে।
তোমার চারপাশ ঘিরে অবিশ্বাসের গাঢ় অন্ধকার,
অনুসন্ধানের ছোট ছোট দ্বীপপুঞ্জ, গেস্টাপোর পুনরুত্থান,
ব্যবসায়ীদের চক্রান্ত আর পুলিসী সন্ত্রাস।

[illegible] ভেজা উদ্যানে যেখানে একদিন সোচ্চার হয়ে উঠেছিলো
জেফারসনের উদাত্ত কণ্ঠস্বর,
আজ সেই ভয়ঙ্কর প্রান্তরে
উন্মত্ত শেরিফ ঘোড়ার পিঠে চড়ে বিধ্বস্ত করছে যত পাঠাগার,
আর নিকারাগুয়ায় শ্রমিক-ইউনিয়নের সদস্যদের
খুন করার জন্যে পাঠানো হচ্ছে রাইফেল।

হাওয়ার্ড ফাস্ট, যে সন্ত্রাস তীক্ষ্ণ-ফলা ছুরির মতো চিলিকে
    ছিঁড়েছুঁড়ে তছনছ করছে,
গোয়েবেল আর সমোজার সেই নিদারুণ বিষ, সেই অপকীর্তি
গ্রীসকে ডুবিয়ে দিচ্ছে গাঢ় অন্ধকারে।
আজ ওরা তোমার মাথার ওপর দিয়ে
ছুটিয়ে দিয়েছে তাদের হাজারো অশ্বারোহী সৈনিক
তোমার দেশকে লুঠ করবে বলে।
আর সেই ঘাতকরাই তোমাকে চিহ্নিত করেছে,
ওরা চায় তোমার মহান রচনা-সম্ভারকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে।
এ সবকিছুই আমরা জানি,
জানি এর চাইতেও অনেক অনেক বেশি কিছু,
কিন্তু আজ আমরা ওদের জন্যে ঠিক প্রস্তুত নই।

যারা তোমাকে ভালোবাসে হাওয়ার্ড ফাস্ট
তারা পৃথিবীর সব প্রান্তেই ছড়িয়ে আছে।
তোমারই মধ্যে আমরা দেখি মানুষের প্রতিচ্ছবি.
তোমারই কণ্ঠস্বরে শুনি মানুষের ঐকতান।
তুমি আর তোমার দেশের মানুষেরই সাথে আমরা এগিয়ে চলি শান্তির দিকে।
গারদের ওপার থেকে আমরা দেখি নিশানের মতো উদ্ভাসিত তোমার মুখ,
আর কান পেতে শুনি কারারক্ষীর প্রতিটা পায়ের শব্দ।
তোমারই মতো দৃঢ় পদক্ষেপে আমরা এগিয়ে যাবো হাওয়ার্ড ফাস্ট,
পৃথিবীর বুকে উদ্ভিন্ন হয়ে উঠবো অগণতি মানুষ।

আমাদের দুর্জয় শক্তি হয়ে উঠবে সমুদ্রের মতো সীমাহীন
আর আজকের এই শৃঙ্খল হবে আগামী দিনের জয়ের সূচনা

লুই কর্টেজ

হ্যাঁ দোস্ত, আমার নাম লুই কর্টেজ্।
শয়তানগুলো যখন টোকোপিলায় পৌঁছলো
গ্রেফতার করলো আমাকে, টেনে নিয়ে গেলো পিসাগুয়ায়।
তোমরা তো জানো দোস্ত, সে জায়গাটা
কি ভয়ংকর নারকীয়। কত সঙ্গীসাথী মারা গেলো
কত সঙ্গী পাগল হয়ে গেলো।
গঞ্জালেজ ভিডেলার সবচেয়ে জঘন্যতম কারাগার সেটা।
এঞ্জেল ভিয়াস তো সেদিন সকালে
আমার চোখের সামনেই মারা গেলো,
খুনে কাঁটাতার দিয়ে ঘেরা কি ভয়ংকর কদর্য পরিবেশে
বালির স্তূপের ওপর ছটফট করতে করতে সে মারা গেলো।
তারপর আমিও পড়লাম অসুখে। বুকের দোষ।
ওরা আমাকে বদলি করলো গ্যারিটায়ারের কয়েদখানায়।
তুমি তো সে জায়গাটা কখনও দেখোনি দোস্ত
চেনোও না। জায়গাটা
হাজার পাঁচেক ফুট উঁচু একটা পাহাড়ের গায়ে
বলিভিয়ার একেবারে শেষ সীমান্তে।
নির্জন আর ভয়ংকর নিষ্ঠুর সে দেশ।

মুখে দেওয়া যায় না পানীয় জল এমনই লোনা,
তাতে আবার পোকাভর্তি।
সেই হিমেল নির্জনতায় ঠাণ্ডা পড়লে মনে হয় বুঝি আকাশ ভেঙে পড়বে,
গুঁড়িয়ে দেবে বুকের হাড়পাঁজরা আর ধুকপুকানি।

আমাদের কষ্ট দেখে কারারক্ষীদেরও চোখ ফেটে জল আসতো,
কিন্তু ওরা আর কি করবে—ওরা যে হুকুমের চাকর মাত্র।

পিঠের তলায় কোনো তক্তা বা শক্ত কিছু না দিয়েই
ওরা আমাকে খচ্চরের সঙ্গে জুতে দিলো,
তারপর ছাব্বিশ মাইল খাড়া উৎরাই।
জীর্ণ কাঠামোতে আর সয় না,
মনে হলো হাড়গোড় বুঝি সব ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে,
কতো দিন বাঁচবো, আদৌ বাঁচবো কিনা তাই-ই জানি না।
কিন্তু দোস্ত, এ মৃত্যুভয় তোমাদেরও
জেনো এর হাত থেকে কারুর রেহাই নেই।

আজ আমার আর কিছুই চাওয়ার নেই.
কেবল শুধু এইটুকু
তোমরা সবাই সোচ্চার গলায় বোলো—
যারা ওই সাক্ষাৎ শয়তান ভিডেলাটাকে গদিতে বসিয়েছে
তাদের কারুর রেহাই নেই,
আমাদের দুর্দশা দেখে তারা দূর থেকে যতই হাসুক না কেন
তাদের কারুর রেহাই নেই।
দোস্ত, অন্তরঙ্গ সাথীরা আমার,
আমার বা কারুর মৃত্যুতেই কোনো দুঃখ নেই,
তোমাদের হাতে এ লড়াই চলবেই, তোমরাই আমাদের
সমস্ত দুঃখ-দুর্দশা ফাঁস করে দিও—বলো, কোনোদিনও ভুলবে না।

পার্কে মৃত্যু

এক

তোমরা যারা মৃত তাদের জন্যে আমি এখানে কাঁদতে আসিনি।
তোমরা যারা এখনোও জীবিত তাদের সঙ্গে আমি কথা বলতে এসেছি,

আমার এ কথাগুলো তোমাদের জন্যে,
আমার নিজের জন্যে।

অন্যেরা মারা গেছে অনেক আগেই। মনে পড়ে ?
নিশ্চয়ই তোমাদের মনে আছে
তারা ঠিক এই রকম, তোমাদের মতো,
তোমাদেব নামের মতো একই তাদের ডাক নাম।

বর্ষাস্নাত লনকুইমেতে
সান গ্রেগোরিওতে
ঊষর রানকুইলে
দারুণ ঝোড়ো হাওয়া আর বহমান বালির স্রোতে
সমুদ্রের প্রান্ত থেকে মরুভূমির প্রান্ত অবধি
অর্ধেক ঢাকা ইকুইকুয়েতে,
ধোঁয়া আর বৃষ্টির রেখাকে অনুসরণ করে
ওপরের তৃণভূমি থেকে নিচের দ্বীপপুঞ্জ অবধি
অন্য সব মানুষদের হনন করা হয়েছে :
আন্তনিওর মতো
তোমাদের নামের মতো, অন্য সব মানুষের নাম,
জেলে, কামাব, তোমাদেরই মতো যারা নানান ধরনের কাজ করে
আজন্ম লালিত চিলিতে,
বাতাসের তীক্ষ্ম চাবুকে মুখ তাদের ক্ষতবিক্ষত,
পাম্পাসের বিস্তীর্ণ তৃণভূমির মতো
নিঃসঙ্গ যন্ত্রণার রক্তাক্ত স্বাক্ষর জড়ানো তাদের সারা দেহে।

দুই

আমাদের স্বদেশভূমির সারাটা সীমান্ত জুড়ে,
তুষারের স্ফটিকস্বচ্ছ উজ্জ্বল সমুদ্রসৈকতে
সবুজ শাখানদীর অলিগলির আড়ালে লুকনো গন্ধক
আর অঙ্কুরিত বীজের অন্তরালে

আমি খুঁজে পাই
আমাদের দেশের মানুষের গাঢ় রক্তের ফোঁটা।
আর প্রতিটা ফোঁটাই
দাউ দাউ জ্বলে ওঠে আগুনের লেলিহান শিখার মতো।

তিন

এক সময় ছিলো।
যখন রক্ত চিরদিনই লুকিয়ে থাকতো শিকড়ের নিচে
চিরদিনই নিঃশব্দে মুছে যেতো বিস্মৃতির অতল গহনে :
(সে সব বহুদিন আগে) দক্ষিণের বৃষ্টি হারিয়ে যেতো মাটির তলায়
(সে সব বহুদিন আগে) অথবা নাইট্রোজেনে শুকিয়ে যেতো
পাম্পাসের বিস্তীর্ণ তৃণভূমি।
এমনি ভাবেই মৃত্যু হতো আমার দেশের অগণিত মানুষের :
এ যেন ঠিক রুক্ষ পাহাড়ি ভূমিতে পাথর গড়িয়ে পড়ার মতো
কিংবা সমুদ্রের বুকে ঝরনার জলোচ্ছ্বাস।
উত্তর থেকে দক্ষিণে, যেখানেই কোনো মৃত্যু ঝরে পড়তো
ওরা হারিয়ে যেতো উৎচকিত অন্ধকারে, কিংবা মিশে যেতো
পিরামিডের ঘন গভীরতায় :
আর রাত্রির মৃত্যুময়তায় ওরা নিঃশব্দে জ্বলে উঠতো
সমুদ্রে হারিয়ে যেতো ওদের ভস্মরাশি।

কেউ জানে না ওরা কোথায়,
কোনো স্মৃতিসৌধই রচিত হয়নি ওদের জন্যে :
একটি জাতির গভীর শিকড় জড়িয়ে ধরেছে ওদের
আত্মোৎসর্গিত আঙুল, ওদের বিদীর্ণ হৃদয়।

আহা, চিলির কলোচ্ছ্বাস,
পাম্পাসের রুক্ষ মাটি
নিস্তব্ধতায় তোলো তোমাদের উদাত্ত কন্ঠস্বর :
জীবিত কোনো মানুষই জানে না কোথায় ঘাতকেরা

তোমাদের লুকিয়ে রেখেছে বিস্মৃতির কোন গোপন অন্তরালে।
অথচ যেদিন
সারাটা দেশ আবার পুনরুজ্জীবিত হবে
মাটি থেকে তোমরা লাফিয়ে উঠবে
তোমাদের হারানো রক্তের প্রতিশোধ নিতে।

চার

এই অপরাধ সংগঠিত হলো পার্কে, উন্মুক্ত জনস্থানে।
নিষ্পাপ রক্তস্রোত ঝরে পড়েনি কোনো গহন অরণ্যে
না পাম্পাসের গোপন বালিতে।
কেউ একে বাধা দেবার কোনো চেষ্টাই করেনি।
এই অপরাধ যথার্থই সংগঠিত হলো আমারই দেশের বুকে।

পাঁচ

একদিন আমিও ছিলাম অজানা বীরদের সাথে তৃণের শয্যায়
যারা এ পৃথিবীর কঠিন পাহাড়ি চূড়া থেকে
খুঁড়ে নামিয়ে ছিলো উর্বর তুষারকণা :
মহান ধর্মঘটের দিনে
আমি ছিলাম সেই সব মানুষের সাথে,
এখনও আমার স্পষ্ট মনে পড়ে ওদের উচ্ছ্বসিত সেই বিপুল করতালি
ওরা আমাকে বললো, 'দ্যাখো দ্যাখো, ভাই আমার
আমরা কেমন উচ্ছল বেঁচে আছি
এই হাম্বারস্টোনে, মাপোচোয়ে,
রিকাভেন্তুরায়, পালোমায়,
প্যান দ্য জুকারে,
পিওজিলোয়।'
ওরা আমাকে দুঃখের শেকড়ে কামড় দিতে বললো
যা ওঁদের সবাইকে দেয় রুটি, সেই ওদের একমাত্র ললিত সান্তনা :
ওরা আমাকে দেখালো
ওদের বাড়ির নিকনো উঠোন, প্রচণ্ড উত্তাপ,

জঘন্য নোংরা পরিবেশ, খাটিয়া ভর্তি ছারপোকা
আর ওদের সারাটা জীবন জুড়ে আছে যে অন্তহীন নির্জনতা।
আমি দেখলাম
কোদালের ঘায়ে ঘায়ে ঝরে পড়া ওদের ঘামের ধারা
আর গাঁইতির কাঠের হাতল চেপে ধরা হাতগুলো কেমন রেখে যাচ্ছে ওদের
সম্পূর্ণ হাতের ছাপ।
আমি শুনলাম
পিরামিডের অতল গহন থেকে উঠে আসা
বিলাপ-মুখর একটা কণ্ঠস্বর
যেন উৎচকিত হয়ে উঠে এলো নরকের জঠর থেকে
তারপর ঘুরে ঘুরে হারিয়ে গেলো মুখহীন অন্ধ পশুর মতো
মুখোসের মতো রক্ত, ঘাম আর নোংরায় একাকার
এক আসন্ন নবজাতক।
নামহীন সেই নবজাতক আমাকে চিৎকার করে বললো :
'যেখানেই যাও না কেন,
ভাই আমার,
অন্য সব ভাইয়েদের ডেকে বোলো অসহ্য এই যন্ত্রণার কথা,
যাদের সারা জীবন সারাটা জীবন কেটেছে নরকের এই আঁস্তাকুড়ে।'

ছয়

জনতা, এখানেই তোমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলে
পাম্পাসের অবদমিত শ্রমিকদের সঙ্গে হাত মেলাবে
প্রস্তাব নিয়েছিলে :
নারী পুরুষ আর শিশু,
তোমরা ওদের সবাইকে ডেকেছিলে
এক বছর আগে এই পার্কে।
এবং এখানেই
তোমাদের রক্ত নিঃশব্দে ঝরে পড়েছিলো।
দেশের এই বিশেষ কেন্দ্রে, প্রাসাদের সামনে, রাস্তার ঠিক মাঝখানে
বয়ে গিয়েছিলো রক্তের স্রোত,

আর সারাটা পৃথিবী তা অপলক তাকিয়ে তাকিয়ে দেখেছিলো।
কেউ তাকে মুছতে সাহস করেনি :
তোমাদের রক্তচিহ্ন ওখানে রয়ে গেলো নিষ্কম্প নিথর নক্ষত্রের মতো।

চিলির মানুষদের হাতগুলো যখন একের পর এক প্রসারিত
আঙুলগুলো ওঁচানো পাম্পাসের দিকে
আর হৃদয়ের অতল থেকে উঠে আসা তোমাদের সমবেত কণ্ঠস্বর
প্রতিধ্বনিত একসাথে,
জনতা
তোমরা যখন মিছিলে চলেছো তোমাদের নিজেদের পার্কে
গান গাইছো নিবিড় আশা, দুঃখ আর বেদনার,
ঘাতকের কলঙ্কিত হাত তখন
সারাটা পার্ক ভিজিয়ে দিলো তোমাদেব গাঢ় রক্তে।

সাত

এমনি ভাবেই জন্ম নিলো আমার দেশেব পতাকা :
ওদের দুঃখের ছেঁড়া কাঁথায় মানুষ তাকে সেলাই করে নিলো
ভালোবাসার উজ্জ্বল সুতোয় ওরা তাতে নকশা তুললো।

ওরা ওদের পোশাক থেকে কেটে নিলো
কিংবা হয়তো আকাশের একটা টুকরো
যার নীলিম গহ্বর থেকে দেখা যায় ওদের দেশের নক্ষত্র,
আর ত্রস্ত হাতে ওরা সেখানে নক্ষত্রটাকে বসিয়ে দিলো
দুর্লভ পান্নার মতো।
ফোঁটায় ফোঁটায় যা দেখতে দেখতে হয়ে উঠলো গনগনে লাল।

আট

এই বিকেলে আমি ওদের একে একে ডাকলাম।
একে একে আমাদের স্মৃতিতে ফিরে এলো
পার্কের এই বিকেল।

বিশ্বস্ত কমরেড
ম্যানুয়েল আন্তনিও লোপেজ :
লিসবোয়া ক্যালড্রন,
যদিও অন্যেরা তোমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে
তবু আমরা এগিয়ে যাবো তোমারই পথে।

এলিজানন্দ্রো গুতিয়েরেজ,
পড়ে গিয়েও সারাক্ষণ তুমি শক্ত হাতে
নিশানটা ওপরে তুলে ধরে রেখেছিলে।

থেসার তাপিয়া,
রক্তনিশানে প্রজ্বল তোমার হৃদয়
পার্কের দক্ষিণা বাতাসে
আমি এখনও শুনি তোমার হৃদয়ের স্পন্দন।

ফিলোমিনো চাভেজ,
আমি কখনও তোমার সঙ্গে করমর্দন করিনি
তবু এখনও স্পষ্ট অনুভব করি তোমার অমলিন সে হাতের স্পর্শ
এমন কি নগ্ন মৃত্যুও যাকে কঠিন করতে পারেনি।

রামোনা পারা,
আকাশের রূপসী নক্ষত্রের মতো আশ্চর্য সুন্দর
অনন্যা নায়িকা, রামোনা পারা
রক্তাক্ত একটা মুকুল, প্রিয় তরুণী রামোনা পারা
কঠিন ইস্পাত হৃদয় মেয়ে, স্বর্ণকেশরী যোদ্ধা, রামোনা পারা
তোমার নামে আমরা শপথ নিলাম
আমরণ চাল্যাবোঁ এই সংগ্রাম
যতদিন না তোমার ঝরানো রক্ত আবার পুষ্পিত হয়ে ওঠে স্বাধীনতায়।

উদ্যত রাইফেল নিয়ে ওরা যখন এলো এই পার্কে
নিষ্ঠুর ভাবে হত্যা করার আদেশ নিয়ে ওরা যখন এলো এই পার্কে
দেখলো গান গাইছে অগণিত মানুষ
দেখলো আদর্শ আর ভালোবাসায় সম্মিলিত অজস্র মানুষ।

শীর্ণ এক তরুণী সহসা ঢলে পড়লো মাটিতে
হাতের মুঠোয় আঁকড়ে ধরা তার রক্তনিশান :
একজন তরুণ বিক্ষত বুকে ঘুরে পড়লো একপাশে :
একরাশ নিটোল নিস্তব্ধতায় মানুষ
অবাক বিস্ময়ে দেখলো ওদের পড়ে যেতে
আর নিঃশব্দে ওদের দুঃখের ঢেউ সহসা ফেটে পড়লো প্রচণ্ড ক্রোধে।

শেষ পর্যন্ত ওরা ওদের নিশানগুলো ডোবালো রক্তে
তারপর মেলে ধরলো জল্লাদদের মুখের সামনে।

দশ

এইসব মৃতদের নামে
আমার দাবি ওদের চরম শাস্তি।

কেননা আমাদের পিতৃভূমিকে যারা রক্তে স্নান করালো
আমার দাবি ওদের চরম শাস্তি।

কেননা যার আদেশে এই ঘৃণ্য অপরাধ সংগঠিত হলো
আমার দাবি তার চরম শাস্তি।

কেননা এইসব মৃতদেহের ওপর দিয়ে যে ঘাতকেরা সদর্পে হেঁটে গেলো
আমার দাবি ওদের চরম শাস্তি।

কেননা এই অপরাধকে যারা ক্ষমার চোখে দেখলো

আমার দাবি ওদের চরম শাস্তি।

আমি ওদের হাতগুলো কখনও ভুলেও স্পর্শ করতে চাই না
আমি ওদের রক্তকলঙ্কিত হাতগুলো স্পর্শ করতে ঘৃণা বোধ করি,
আমি চাই ওদের শাস্তি।

আমি চাই না ওরা আমাকে কোথাও রাষ্ট্রদূত করে পাঠাক
কিংবা শাস্তি না হওয়া পর্যন্ত এই পার্কটা নতুন তৈরি বাড়িতে ভরে যাক।
আমি দেখতে চাই ওদের বিচার
ঠিক এখানে, খোলা হাওয়ায়, উন্মুক্ত এই জনস্থানে।

আমি দেখতে চাই ওদের চরম শাস্তি।

এগারো

আমি এখন সেইসব মৃতদের সঙ্গে কথা বলবো
যেন ওরা এখনও এখানে।
ভাইয়েরা আমার : চলবে,
এ দেশে আমাদের সংগ্রাম চলবে ক্ষেতে খামারে
কলে কারখানায়
সংগ্রাম চলবে পথে পথে, গন্ধকের খনিতে, পাম্পাসে।
সবুজ লাল আলোয় প্রদীপ্ত তাম্রখনির জ্বালামুখে
গাঢ় অন্ধকার স্যাঁতসেঁতে কয়লাখনির স্তরে স্তরে
রচিত হবে আমাদের সশস্ত্র প্রতিরোধ।
আর তোমাদের মৃত্যু সাক্ষী
এইসব রক্তনিশান
বসন্তের ঘন পত্রালির মতো জড়াবে আমাদের হৃদয়।

বারো

হাজার বছর ধরে এই পার্কে পায়ে পায়ে পথ চলায়
মুছে যাবে না আমাদের রক্তের চিহ্ন

এই পাথরের বুক থেকে :
অজস্র কণ্ঠের বুদ্‌বুদে এই নিস্তব্ধতা ভরে গেলেও প্রতিধ্বনিত হবে সেই
ঘণ্টাধ্বনি,
জানাবে তোমাদের মৃত্যু সম্মান :
যদিও বৃষ্টি নাড়িয়ে দিতে পারে দেওয়ালের ভিত
তবুও নির্ভিয়ে দিতে পারবে না তোমাদের আত্মোৎসর্গিত নামের
প্রজ্বলিত শিখা,
এমন কি নির্যাতনের হাজারো রাত্রির মৃত হাতটাও
শ্বাসরুদ্ধ করে দিতে পারবে না
অনাগত সেই দিনটির জন্যে উন্মুখ আমাদের স্পন্দিত আশা,
তামাম পৃথিবী জুড়ে
যার প্রতীক্ষায় আমরা মুখ চেয়ে বসে আছি—
যন্ত্রণাশেষের সেই দিনটি
নগ্ন সংগ্রামের শেষে পাওয়া ন্যায়বিচারের সেই দিনটি :
আর তোমরা, মৃত ভাইয়েরা আমার. মানুষেব আশা যখন প্রজ্বল
বিজয়ের অমিত উল্লাসে
তোমাদের কণ্ঠস্বরও নিস্তব্ধতা ছাপিয়ে ভরে উঠবে
স্বাধীনতার তীব্র উতরোলে।

পলাতক

জীবনের দীর্ঘদিন নিষুত রাত্রে আমি ঘুরে বেড়িয়েছি
ছিন্ন পোশাকে, রিক্ত, অশ্রুসজল,
কাটিয়েছি আমার নির্যাতিত জীবনের সেইসব দিনগুলো
পুলিসের হাত থেকে পলাতক
স্বচ্ছতার মুহূর্তে, তারাদের নিবিড় নির্জ.. ায়
আমি একের পর এক
অতিক্রম করে গেছি অরণ্য শহর বন্দর

ছোট ছোট ক্ষেত খামার
একজনের দরজা থেকে আর একজনের দরজায়
একজনের হাত থেকে আর একজনের হাতে
তারপর অন্য আর একজনের।
নিদ্রালস রাত্রি,
অথচ মানুষই জানিয়েছে তার অন্তরঙ্গ সংকেত :
অন্ধের মতো নিঃসঙ্কোচে আমি পেরিয়ে গেছি পথ
আলোকিত দরজায়
একফোঁটা নক্ষত্রের মতো আমারই ছোট্ট ছায়া,
অরণ্যের নেকড়ের চেয়ে ক্ষুধার্ত গোগ্রাসে আমি
রুটির টুকরোটা গিলে নিই।

সেদিন রাত্রে এলাম
উন্মুক্ত মাঠে ছোট্ট একটা ঘরে,
এর আগে ওটা কেউ দেখেনি,
এমন কি অনুমানও করতে পারেনি
মানুষগুলোর জীবন সম্পর্কে।
ওদের ব্যবহার সেই মুহূর্তে আমার কাছে
মনে হলো এক নতুন অভিজ্ঞতা।
আমি ভেতরে প্রবেশ করলাম,
পাঁচজনের একটা পরিবার :
ওরা সবাই উঠে দাঁড়ালো
যেন রাত্রির বুকে জ্বলে উঠলো একটা দীপ্ত শিখা।
আমি পরস্পরের হাতে
হাত রাখলাম, তাকালাম পরস্পরের মুখের দিকে,
ওরা আমাকে কিছুই জিগেস করলো না,
ওরা ছিলো শুধু দরজাটা আগলে।
আমি রাস্তার দিকে একবার ফিরেও তাকালাম না,
নিজের চোখও চিনতে পারলো না আমার মুখ,
আর সদ্যাগত সেই আশ্চর্য রাত্রে

নিজের ক্লান্তিকে সর্বাঙ্গ বিছিয়ে
আমার দেশের গভীর যন্ত্রণাকে বুকে নিয়ে
আমি অপলক তাকিয়ে রইলাম।

ঘুমে যখন জুড়ে আসছে দু চোখের পাতা
পৃথিবীর বিচিত্র প্রতিধ্বনি, তার তুমুল রলোরোল
তার কোমল নির্জনতা
জাগিয়ে রাখলো রাত্রিকে
আমি ভাবলাম : এ আমি কোথায় এলাম ?
ওরা কারা ? কেন আজ এমন করে
আমার যত্ন নিচ্ছে ? ওরা
এর আগে যারা আমাকে কখনও দেখেনি.
কেন আমার সামনে দরজাটা এমন হাট করে খুলে দিলো
কেন আড়াল করে রাখলো আমার গানকে ?
কেউ কিছুই বললো না,
কেবল পাতায় ছাওয়া রাত্রির মর্মর.
ঠাসবুননি ঝিঁঝির ডাক
আর তার নিবিড় পত্রগুচ্ছের মাঝে
সারাটা রাত মনে হলো যেন মৃদুমন্দ কাঁপছে।
নৈশ পৃথিবী
তুমি আমার জানলার সামনে
নিয়ে এলে তোমার অনন্য ঠোঁটদুটি
যাতে অজস্র ঝরা পাতায়, ঋতুতে ঋতুতে, নীড় থেকে নীড়ে
শাখা থেকে শাখায়, তোমার গহন শিকড়ের
নিবিড় শান্তিতে আমি একটু ঘুমতে পারি।

দুই

আঙুরের বনে তখন শরৎ !
নির্জন নদীর বাঁকে, দড়ির মাচায়, গুচ্ছ গুচ্ছ আঙুরে
শুভ্র তুষারের অবগুণ্ঠন,

পাতাগুলো বাতাসে তিরতির করে কাঁপছে।
এ বাড়ির মালিক শীর্ণমুখ এক নিপুণ কিষাণ
সারা গায়ে মাটিমাখা গোধূলির গন্ধস্বন।
এ বীথির প্রতিটা গাছ
প্রতিটা ফল
প্রতিটা পাতা জানে তার নিবিড় মমতা।
তার ঘোড়াদের সাথে সে কথা বলে
ঠিক যেমন কথা বলে শিশুদের সাথে,
পিচ গাছের ছায়ার নিচে
বাড়ির কুকুর বেড়ালগুলো তার
পায়ে পায়ে জড়িয়ে জড়িয়ে হেঁটে যায়,
কেউ পিঠ বেঁকিয়ে, কেউ শ্লথ পায়ে
কেউ বা দৌড়ে।
সে জানে প্রতিটা শাখা, গাছের প্রতিটা ক্ষত।
ঘোড়াদের সে যখন আদর করে
তার প্রাচীন কণ্ঠস্বর আমাকে করে তোলে·দীপ্ত·অনুপ্রাণিত।

তিন

আমি আবার খুঁজি অন্ধকার।
শহর পেরিয়ে এন্দ্রেসের উন্মুক্ত পাহাড়ি রাত
আমার চলার পথে ফুটিয়ে তোলে অজস্র গোলাপ
দক্ষিণে তখন শীত।
পাহাড়ের উত্তুঙ্গ চূড়ায় বরফ·জমাট।
মাপোচো নদী তুষারে ঢাকা।
স্বেচ্ছাচারীর রক্তকলঙ্কিত শহরের
এক রাস্তা থেকে অন্য রাস্তা আমি
নিঃশব্দে পেরিয়ে চলেছি,
চোখে মুখে বুকের গভীরে আমার
চলকে উঠছে অজস্র ভালোবাসা।
কেননা প্রতিটা পথ

তুষার ছাওয়া এই রাত
মানুষের এই নৈশ নির্জনতা
মৃত্যুলীন মানুষের মতো এই অতল
নিমগ্নতা,
ভীরু আলোর ছোট্ট শিখায়
কেঁপে ওঠা সেই জানলা
গায়ে গায়ে ঠাসা বস্তিবাড়ির চূর্ণ কালো প্রবাল
আমার দেশের দুরন্ত ঝোড়ো হাওয়া—
সব
সবই আমার আশ্চর্য চেনা,
সবই নিঃশব্দে চলকে ওঠে আমার বুকে,
ভালোবাসার অনন্য একটি মুখ।

চার

তরুণ এক দম্পতি খুলে দিলো অন্য আর একটা দরজা
তাও আমার কাছে সম্পূর্ণ অজানা।
বলিষ্ঠ তরুণ ইঞ্জিনিয়ার,
তরুণী গ্রীষ্মের মতো স্বর্ণাভ।
তারপর থেকে ওদের পানীয় আর রুটিতে
আমিও ভাগ পেলাম,
একটু একটু করে
পৌঁছে গেলাম ওদের অজানা অন্তরঙ্গতায়।
ওরা আমায় বললো: 'পারস্পরিক
ভুল বোঝাবুঝিগুলি আমরা বহুদিন আগেই
বিচ্ছিন্ন করেছি,
আজ আপনারই জন্যে আমরা দুজনে
অপেক্ষা করে বসে আছি।'

সেদিন ছোট্ট ঘরটায়
সমবেত আমরা গড়ে তুললাম নৈঃশব্দ্যের এক দুর্গতোরণ।

এমন কি ঘুমেও
আমি ছিলাম নিশ্চুপ।
আমি ছিলাম শহরের প্রতিটি মহীরুহে
শুনতে পেলাম ঘাতকের নিঃশব্দ পদসঞ্চার,
মাঝে শুধু একটা দেওয়ালের ব্যবধান,
আমি শুনলাম কারারক্ষীর কুৎসিত গলিত কণ্ঠস্বর
ঘাতকের উৎচকিত হাসি
আমার দেশের গুলিবেঁধা বুকে মাতালের
উল্লোল উল্লাস!
শয়তান হোলগারস্ আর পবলেট'রা নিঃশব্দে
ভিড় করে এসে দাঁড়ালো আমার সামনে,
ওদের টেনে চলা পায়ের শব্দে বুকের ভেতরটা আমার
দাউ দাউ করে জ্বলে উঠলো :
ওরাই আমার দেশের মানুষকে
ঠেলে দিয়েছে নির্যাতনের পথে।
তারপর রাত্রে—
আমি আবার নিভৃত সংলাপে ভরিয়ে তুলি
'এদিয়াস ইরেন,
এদিয়াস এন্দ্রেস, আমার নতুন পাওয়া বন্ধু, এদিয়াস।
এদিয়াস নক্ষত্রে
এদিয়াস নতুনবাঁধা ভারায়
এদিয়াস হয়তো আমার জানলার সামনে
যেন অপচ্ছায়াভরা কোনো অসমাপ্ত বাড়িতে,
এদিয়াস পাহাড়ের উত্তুঙ্গ চূড়ায়
প্রতিটা গোধূলিতে যা আমার চোখে পড়ে,
এদিয়াস নিয়ন আলোর সবুজ সংকেতে
যার প্রতিটা চমক আমাকে স্মরণ করিয়ে দেয় সেই নতুন রাত্রি।

পাঁচ

অন্য সময়, অন্য আর এক রাত্রে আমি

আরও এগিয়ে চলি,
প্রশান্ত মহাসাগরের বিস্তীর্ণ বালিয়াড়ি ঘেরা
পর্বতমালা ডিঙিয়ে দূরে,
তারপর
আবার ঘুরপথে
অন্ধকার অলিগলি পেরিয়ে : ভালপারাইসো।
আমি প্রবেশ করলাম
এক নাবিকের বাড়িতে। ওর মা
আমার জন্যে অপেক্ষা করছিলেন।
উনি বললেন—'গতকালও আমি জানতাম না,
ছেলে আমাকে বললো
আর তোমার নাম
নির্বাপিত আগুনের শিখার মতো জ্বলে উঠলো আমার মনে।
আমি ছেলেকে বললাম
কোন আরামের ব্যবস্থাটা আমরা ওর জন্যে করতে পারি ?
ছেলে বললো
উনি আমাদের, উনি নিঃস্ব মানুষের।
উনি এসব কিছুই ভাববেন না
বা ব্যঙ্গ করবেন না আমাদের দারিদ্র্য দেখে
উনি এসব পছন্দও করেন না।
আমি ছেলেকে বললাম
তাহলে এ ঘর আজ থেকে তারই।'
সেই ঘরে
কেউ আমাকে চেনে না।
আমি তাকালাম পরিচ্ছন্ন টেবিলের ঢাকার দিকে,
জলের পাত্রটা যেন রাত্রির অতল থেকে স্ফটিকের স্বচ্ছ পাখা মেলে
উড়ে এসেছে এইখানে।
আমি গেলাম জানলার কাছে :
ভালপারাইসো মেলে দিয়েছে তার অজস্র
প্রকম্পিত চোখের পাতা,

নৈশ সমুদ্র-বাতাস স্পর্শ করলো আমার ললাট
পাহাড়ের গায়ে টিপটিপ আলো
জলের বুকে নাবিক জ্যোৎস্নার ঝিলিমিলি
বিশাল সাম্রাজ্যের মতো অন্ধকার
জ্বলে উঠলো পান্নার সবুজ দ্যুতিতে,
জীবনে যাকিছু নীলিম শান্তি চলকে উঠলো
আমার বুকে।
আমি চারদিকে তাকালাম :
টেবিলে সাজানো হয়েছে রুটি, মদ, পানীয়, ন্যাপকিন,
মাটির স্নিগ্ধগন্ধ মাখা একটুকরো কোমলতা
ভিজিয়ে দিলো আমার সংগ্রামী চোখের পাতা।

সেই জানলা ছাড়াও
ভালপারাইসোতে আমি কাটিয়েছি
কয়েকটি দিন আর রাত্রি। আমার সেই নতুন বাড়িতে
নাবিকেরা প্রায়ই আসতো
তা বলে অটোমেনিয়া বা সুলতানা জাহাজে চড়ে নয়, ওরা আসতো
পায়ে হেঁটে।
দীর্ঘদিন প্রতারিত হয়েছে ওরা
ওরা আমাকে সবকিছুই বুঝিয়ে বলতো :
পদস্থ কোনো অফিসারকে
মেয়ে জুগিয়ে দিলে কেমন করে বেশি পয়সা রোজগার করা যেতো :
সানটিয়াগোর প্রাসাদের মতো
এখানের সবকিছুই দূষিত কুৎসিত।
এখানে করপোরাল কিংবা সেকরেটারির পকেট
প্রেসিডেণ্টের পকেটের মতো
অত উন্মুক্ত না হলেও
গরীবের কঙ্কাল কামড়ে ধরার পক্ষে তা যথেষ্ট।
পুলিসের তাড়া খাওয়া তস্করের পেছনে ছোটা কুকুরের মতো
অসুখী একটি প্রজাতন্ত্র।

অসুখী দেশ,
রাস্তার এক কোণে বিদেশী নিলাম থেকে কিনে আনা
ভিদেলা-ঘোড়ার কেশর চেপে
গুপ্তচরের বমিতে ছুটে যাওয়া
মাতাল জুয়াড়ী।
একটা মানুষের হাতে বিপর্যস্ত প্রজাতন্ত্র
যে বিক্রি করে দিয়েছে তার নিজের মেয়েকে
দেশকে উপহার দিয়েছে কেবল নির্যাতন।
দুজন নাবিক এসে
নৌকা বোঝাই খাবার আর কলা নিয়ে আবার ফিরে গেলো,
লবণাক্ত সমুদ্রে প্রচণ্ড ক্ষুধায়
ওরা পাবে এক টুকরো নাবিকি রুটি আর
বিশাল আকাশ।

আমার নির্জনতার দিনে
সমুদ্র উধাও : তাই আমি আবার পাহাড়ে ফিরে যাই,
ঝুলোনো বাড়িতে চোখে পড়ে দীপ্ত শিখা,
ভালপারাইসোর জীবনস্পন্দন :
সারা পাহাড় জীবনপ্রাচুর্যে ভরপুর
দরজায় লাল নীল রঙ
হাতলবিহীন ঘোরানো সিঁড়ি
চারদিকে জালের মতো ছড়ানো কুয়াশা
রুক্ষ খাঁড়ির বুকে প্রাণপণে শিকড় চালানো গাছ
মেলে দিয়েছে তার ডালপালা।
সহসা তীক্ষ্ণ শিস,
উৎচকিত নাবিকি কণ্ঠস্বরে
রোমাঞ্চিত হয়ে উঠলো আমার সারাটা শরীর।

ছয়

পাহাড়ের গায়ে জানলা,

খনিজ টিনের মতো হিমেল ভালপারাইসো,
পাথর আর মানুষের কান্নায় ছিন্নভিন্ন!
আমার গোপন আস্তানা থেকে তাকিয়ে দেখ
জাহাজে সাজানো ধূসর বন্দর, নিথর জলে
জ্যোৎস্নার ঝিলিমিলি।

এক ঘণ্টা আগেও
তোমার সমুদ্র, ভালপারাইসো,
ছোট ছোট বাণিজ্যপোতে মুখর ছিলো,
গম বোঝাই পাঁচ মাস্তুলের ইঞ্জিনের গর্বিত গুঞ্জন,
প্রতিবেশী সমুদ্র থেকে এলো সোরা
স্তূপাকার হলো তোমার গুদামে।
তপ্ত সামুদ্রিক নিদাঘের দীর্ঘ মাস্তুল, বাণিজ্যপোত
আর সামুদ্রিক রাত্রিতে ওড়া নিশান
মগ্ন আবলুস
হাতির দাঁতের মসৃণ স্বচ্ছতা
কফির মিষ্টি গন্ধ
আর জ্যোৎস্না উদ্ভাসিত রাত্রি, ভালপারাইসো,
তোমার ভীষণ শান্তিকে ওরা
ভরিয়ে দিলো
তোমাকে মুক্তি দিলো এক আশ্চর্য স্নিগ্ধগন্ধে।

সাত

পাম্পাসে, দক্ষিণ আমেরিকার বিস্তীর্ণ ঘাসের প্রান্তরে
নামলো বারুদগন্ধি নিশান্তিকা।
প্রচণ্ড শব্দে কেঁপে উঠলো পৃথিবী
যতক্ষণ না চিলি ভরে উঠলো
সম্পূর্ণ ঠাসা একটা বিশাল জাহাজের মতো।
আজ আমি তাকিয়ে দেখলাম
প্রশান্ত মহাসাগরের বালুবেলায়

কোনো চিহ্ন রেখে না যাওয়া হারানো সেইসব
মানুষের মধ্যে তখনও যা কিছু স্মৃতিচিহ্ন হয়ে বেঁচে আছে।
আমি যা দেখি
তাকিয়ে দেখ
আমার দেশের গলার চারদিকে
মাল্যের মতো, স্বর্ণালি বৃষ্টিপাতের মতো
ঝুলছে যত দূষিত আবর্জনা।
মুসাফির, তোমার চোখের স্বচ্ছতায়
আমাকে দেখতে দাও
ভালপারাইসোর অবিচ্ছিন্ন, সম্পূর্ণ নিটোল একটা আকাশ
নিঃসঙ্গ তার দক্ষিণা বাতাসে চিলিবাসীদের জীবন,
রুক্ষ বন্ধ্যাভূমির কালো শিশুটাকে।
ফাটা ছাদ
ভাঙা জানলার সার্সি
দেওয়াল দরজা উধাও, কুষ্ঠরোগীর মতো দগদগে চুনকাম
মেঝেয় পালিলিক শিলামাটির ঘন আস্তরণ।
ভালপারাইসো, অপবিত্র গোলাপ
আর কলঙ্কিত নাবিকি কফিন!
তোমার কণ্টকাকীর্ণ পথে পথে,
তোমার তিক্ত কানাগলির মুকুটে আমাকে আর
আঘাত করো না,
আমাকে দেখতে দিও না
তোমার ভীষণ জলাভূমিতে
দুঃখ জড়ানো বিকলাঙ্গ ছোট্ট শিশুটাকে!
তোমারই মধ্যে আমি সংগ্রাম করি
আমার দেশের মানুষের জন্যে
আমার সমগ্র আমেরিকান পিতৃভূমির জন্যে
তোমার অস্থিমজ্জায় জড়ানো দূষিত কদর্যতাকে
তোমাকে যারা মুক্তি দিলো
তাদের জন্যে

কুকুরেরও পেচ্ছাপের অযোগ্য ছিন্নভিন্ন নিষ্পাপ বুক
সেইসব তুচ্ছ নগ্ন ঈশ্বরদের
যারা ঘৃণায় ছুঁড়ে ফেলে দিলো তাদের জন্যে।

আট

ভালপারাইসো, আমি ভালোবাসি যাকিছু তুমি লুকিয়ে রাখো
তোমার দীপ্ত লাবণ্য, তোমার যাকিছু উজ্জ্বলতা,
এমন কি তোমার শান্ত-বর্ষণ মেঘের আড়ালে
সমুদ্র-কন্যাদেরও। আমি ভালোবাসি
নিষুত সমুদ্রে
নাবিকের জন্যে বিছিয়ে রাখা তোমার আলোকদ্যুতি,
তখন তুমি নগ্ন, উজ্জ্বল,
আর কুয়াশা জড়ানো গোলাপের অবয়বে
তোমার কমলার ফুলগুলো আশ্চর্য ফুটে ওঠে।
কেউ যেন না তোমাকে আগলে রাখে
কিংবা ভীষণ সব অস্ত্রে ভেঙে চুরমার করে দেয় তোমার যাকিছু আমি
ভালোবাসি :
আমি ছাড়া আর কিছুই থাকবে না তোমার গোপনীয়তা :
আমার কণ্ঠস্বর ছাড়া আর কিছুই থাকবে না
শিশিরে শিশিরে তোমার রঙের খেলা,
তোমার জীর্ণ সোপানশ্রেণী
যেখানে সমুদ্রের লবণাক্ত স্নেহে এসে মিশেছে জলের রেখার সাথে,
তোমার তীক্ষ্ম আর্তনাদের বিরুদ্ধে
সেখানে আমার ঠোঁট ছাড়া
আর কিছুই উঠবে না বাতাসের তুঙ্গতায়
ভালপারাইসো,
সামুদ্রিক প্রিয়তমা আমার
সমগ্র বিশ্বে সমুদ্রসৈকতের রানী
জাহাজ আর ঊর্মিমালার কেন্দ্রবিন্দু,
তুমি আমার সত্তায় দীঘল চাঁদের মতো কিংবা নিকুঞ্জে

বাতাসের স্বচ্ছ যাওয়া আসার মতো।
আমি ভলোবাসি তোমার খুনখারাপির ভীষণ অলিগলি
পাহাড়ি চূড়ায় তোমার চাঁদের তীক্ষ্ম ফলা
তোমার উন্মুক্ত প্রাঙ্গণ
নীলিম বসন্তে নাবিকেরা যেখানে নোঙর ফেলে।
প্রিয় বন্দর আমার,
তুমি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো
ভালো মন্দ সম্পর্কে তোমাকে লেখার অধিকার আমার আছে,
কেননা ভাঙা বোতলের মধ্যে
আমি যেন সেই প্রজ্বলিত এক নিষ্ঠুর প্রদীপ।

নয়

হাজারো দ্বীপের নিবিড় মালায় জড়ানো বিখ্যাত সব সমুদ্র
আমি ঘুরে বেড়িয়েছি,
আমি এক সমুদ্রে-ফেরা কবি,
এক যাত্রা থেকে নতুন যাত্রায় আমি পেঁাছে যাই সুদূর ফেনায়,
অথচ তুমি,
সীমাহীন সামুদ্রিক ভালোবাসা,
আমারই সত্তায় নোঙর বাঁধা যেন অন্য অপরিচিত কেউ।
বিশাল সমুদ্রের পাহাড়ি রাজধানী,
তোমার প্রাচীন সেই অর্ধনর-অশ্বের সমুদ্রনীল সৈকত
তোমার সীমান্তরেখা
দোকানে লাল নীল রঙিন খেলনার মতো দীপ্ত জ্বলে ওঠে।
সমুদ্রের পারিপার্শ্বিকতায়
বেলাভূমি আর ছোট ছোট ঘরের মালায়
তোমাকে বেশ মানাবে ভালো, ভালপারাইসো :
অবশ্য তার মানে এই নয় —
সীমাহীন সমুদ্রের ঝোড়ো বাতাস
সবুজ তুষারপাত
বিধ্বস্ত তোমার দেশের দৈহিক নির্যাতন

আর গোপন ভীতি, তোমার তুলে ধরা দীপ্ত মশালের দিকে
ছিটকে ওঠা সাত সমুদ্রের ফেনা,
ছায়াচ্ছন্ন উপলের বিশাল আয়তন
কিংবা গির্জার চূড়ার মতো উঠে যাওয়া দারুণ জলোচ্ছ্বাস।
    ভালপারাইসো,
আমি তোমাকে জানিয়েছি আমার নিবিড় ভালোবাসা,
তোমার রাস্তার মোড়ে আমি আবার ঘর বাঁধতে আসবো
যখন তুমি আমি
আমরা দুজনেই
স্বাধীন হবো।
    তুমি তোমার বাতাস আর ঢেউয়ের সিংহাসনে
আমি আমার দেশের সিক্তভূমিতে !
সমুদ্র আর তুষারে আমরা একদিন দেখবো গণঅভ্যুত্থান।
ভালপারাইসো,
দক্ষিণ সমুদ্রের নির্জনতায়
সবচেয়ে নিঃসঙ্গ সাম্রাজ্ঞী আমার,
প্রতিটি হলুদ খাড়াই পাহাড় বেয়ে আমি নেমে আসি
তোমার উন্মুক্ত শৈলশানুতে
অনুভব করি তোমার বহমান জীবন-স্পন্দন,
রাত্রে তোমার দীর্ঘ সৈকত নিবিড় আলিঙ্গনে আমাকে জড়িয়ে ধরে,
আমি এখনও স্পষ্ট স্মরণ করতে পারি
তোমার সেই নীলিম লাবণ্যোচ্ছলতা।
ভালপারাইসো, সমুদ্রের রানী,
তোমার চেয়ে আশ্চর্য রূপসী সৈকত আমি আর একটাও দেখিনি।

দশ

তাই রাতের পর রাত
চিলির সারাটা বেলাভূমি জুড়ে নেমে আসা
ঘুম জড়ানো দীঘল অন্ধকারে আমি
দ্বার থেকে দ্বারে ঘুরে বেড়াই

আমি পলাতক।

আমার দেশের প্রতিটি প্রান্তর
প্রতিটি পর্ণকুটিরের অন্য কোনো দরজা
অন্য কোনো হাত আমার পদশব্দের প্রতীক্ষায় উন্মুখ।
    হাজারোবার তুমি
পেরিয়ে গেছো সেই রুদ্ধ দ্বার, বিবর্ণ দেওয়াল
শুকনো ফুলে ভরা জীর্ণ বাতায়ন,
কেউ তোমায় জানায়নি আমন্ত্রণ, অথচ আমারই জন্যে
এ গোপন ইশারা, এই স্পন্দন :
    শহিদের আত্মোৎসর্গে
দুঃসহ যন্ত্রণায় পূর্ণগর্ভা এ এক কয়লা খনি অঞ্চল
দক্ষিণ দ্বীপপুঞ্জের কাছাকাছি এ এক সামুদ্রিক বন্দর,
কান পেতে শোনো : জনাকীর্ণ রাস্তায়
দুপুরে গীতিশব্দমুখর মানুষের কলোচ্ছ্বাস,
কিংবা পার্কের ওপারে সেই জানলা,
অন্য কোনো জানলার চেয়ে যার নির্দিষ্ট কোনো পার্থক্য নেই,
হৃদয় উপুড় করা অজস্র প্রীতি নিয়ে
সে আমারই জন্যে অপেক্ষা করছে।

আমার জন্যে সব দরজাই উন্মুক্ত হাট হাট খোলা।
ওরা বলে . ‘ও আমার ভাই
ওকে নিয়ে এসো গরীবের এই পর্ণকুটিরে !’
যদিও আমার দেশ দুঃসহ যন্ত্রণা, দারুণ নির্যাতনে
তিক্ত আঙুরের মতো থেঁতলানো,
তবু আমার কাছে আসে টিন কারখানার শ্রমিক
সেইসব তরুণীদের মা।
হতভাগ্য কিষাণ, সাবান কলের শ্রমিক
রুচিশীল মহিলা সাহিত্যিক, সারাদিন
বিষণ্ণ অফিসে পিনদ্ধ প্রজাপতির মতো মুমূর্ষু কেরানি,
    আসে সবাই,

আর ওদের দরজায় থাকে একটা গোপন সংকেত,
ছোট্ট একটা চাবি বিশাল তোরণের মতো পাহারা দেয়
যাতে আমি নিঃসংকোচে প্রবেশ করতে পারি
দিনে রাত্রে কিংবা পড়ন্ত বিকেলে
যখন খুশি
এবং কাউকে না চিনেই আমি জিগেস করতে পারি :
'ভাই, তুমি তো আমাকে চেনো,
ধরে নিচ্ছি নিশ্চয় আমারই জন্যে তুমি অপেক্ষা করছো।'

এগারো

বাতাসের বিরুদ্ধে তুমি কি করবে, বিশ্বাসঘাতক ?
কি করতে পারো তাদের বিরুদ্ধে
কুসুমিত হবার আশায় যারা ব্যাকুল, যারা আমারই জন্যে
সতর্ক অপেক্ষা করছে, যারা তোমাদের
ঘৃণা করে ?
বিশ্বাসঘাতক, তুমি যাদের অর্থ দিয়ে কিনেছো,
তাদের তুমি বন্দী করতে পারো, করতে পারো অসহ্য অত্যাচার,
বিশ্বাসঘাতক
তাদের তুমি নির্বাসনে পাঠাতে পারো
কিন্তু কখনও কি নিশ্চিন্তে ঘুমতে পারো তোমার রাইফেল
পরিবেষ্টিত কবর-বাসরে ?

অথচ আমি
শান্তিতে নিদ্রা যাই আমারই দেশের বুকে, রাত্রির পলাতক।
আহা, কি গ্লানিময় বিষণ্ন তোমার এ ভঙ্গুর বিজয় !

যখন আরাগঁ, এরেনবুর্গ, এলুয়ার,
ফরাসী কবি, ভেনিজুয়েলার দুঃসাহসী লেখক
আর অসংখ্য সহযোদ্ধারা আমার চারপাশে,
তখন তুমি
ভেদেলার অপনায়ক গনজালেজ্

এস্‌ক্যানিলা, কুয়েভাস,
পেলুচনেক্স আর পবলেট পরিবৃত বিশ্বাসঘাতক !
আমার দেশের মানুষ আমাকে আশ্রয় দেয় কখনও সিঁড়ির
চিলে কোঠায়, কখনও নিচের গুদামঘরে,
আর আমি
আমারই দেশের শান্ত পক্ষপুটে
ছোট্ট ঘুঘুর মতো ঘুমিয়ে পড়ি, স্বপ্ন দেখি
আর ছিন্নভিন্ন বিধ্বস্ত করি তোমার সীমান্ত।

বারো

সবার জন্যে, তোমাদের জন্যে
এই নিঃশব্দ রাত্রি, ছায়ায় যারা জড়িয়ে ধরলো
আমার মতো, তোমাদের জন্যে এই
অবিলোপী আলোর প্রদীপ, নাক্ষত্রিক কারুকার্য।
জীবনের জন্যে যা কিছু প্রয়োজন, অন্তরঙ্গ সাথীরা আমার,
তোমাদের সবাইকে বলি :
কোনো দাক্ষিণ্যেই
ভরে উঠবে না তোমাদের পবিত্রতার পেয়ালা,
না দুর্জয় বসন্তের রক্তকেতনে
তোমাদেরই সুস্থ চেতনার মতো সূর্যের পরিপূর্ণতা।
আমি বিশ্বাস করি কেবল,
    হয়তো নিষ্পাপ মুকুলের সেই সরল প্রাচুর্য আমার আছে
    হয়তো আমি তোমাদেরই একজন,
আত্মচেতনায়
যা এ পৃথিবী, মাটি আর গানেরই অবিচ্ছিন্ন অংশ,
ওরাই জানে কেবল আমি কোথা থেকে এসেছি
আর কাদের সঙ্গেই বা আমার নিগূঢ় সম্পর্ক।
আমি না সুদূরের ঘণ্টাধ্বনি
না এমন গভীর মগ্ন স্ফটিকের স্বচ্ছতা
যাতে তোমরা আমাকে আদৌ বুঝতে পারবে না।

আমি একজন সাধারণ মানুষ,
আমার জন্যে কেবল গোপন দরজা, পোড়া রুটি
আর আমাকে যখন তোমরা নিতে আসো তখন তোমরা নিয়ে যাও
তোমাদেরই কাউকে,
যে অতিথি বারবার আঘাতে নুইয়ে পড়ে, বারবার আবার জন্ম নেয় -
যাকিছু
যাদেরকে আমি চিনি না
যারা এর আগে কখনও শোনেনি আমার নাম
যারা বাস করে আমাদের দীর্ঘ নদীর ধারে ধারে
আগ্নেয়গিরির পাদদেশে
তামার বারুদগন্ধ ছায়ায়
জেলে, কৃষক আর দক্ষিণ আমেরিকার আদিবাসী
জানলার মতো উদ্ভাসিত হ্রদের ওপারে বাস-করা সেইসব নিগ্রো,
এই মুহূর্তে প্রাচীন হাতে
জুতোয় পেরেক ঠুকতে ঠুকতে যে জিগেস করলো আমার কথা
সেই মুচি

তোমরা,
যারা না জেনেও
আমার জন্যে অপেক্ষা করছো,
আমি তোমাদের চিনতে পারলাম,
আমি তোমাদের আত্মার আত্মীয়, তোমাদেরই জন্যে গান গাই।

ভেরো

আমেরিকার বিস্তীর্ণ সমুদ্র সৈকত,
পবিত্র বৃক্ষ-সুসজ্জিত প্রান্তর, আরক্ত পর্বতমালা
অনড় দুর্ভাগ্য-জর্জরিত ভাইবোন আত্মজেরা আমার,
এসো—
যাকিছু স্পন্দিত ফসল,
শস্যকণা মাটিতে ফিরে যাবার আগেই
আমরা সংগ্রহ করি,

হয়তো এখনও নতুন কোনো শস্য জন্ম নিতে পারে,
হয়তো নৈশ বাতাসে প্রতিধ্বনিত তোমাদের কণ্ঠস্বর
ওরা পৌঁছে দেবে অন্যের কানে।
আমরাই জনতার শিকড় থেকে উঠে আসা আশার গান
ওরা পৌঁছে দেবে তোমাদের কাছে—
সম্মিলিত উচ্ছল জীবনে,
গানে পরিপূর্ণ আবার কোনো নতুন ফসলে।

আমার এই হারানো হাত
যদিও এখনও অদৃশ্য
তবু, তোমরা তাকে খুঁজে পাবে অজস্র অন্ধকারে
এমন কি অলক্ষ্য বাতাসেও।
আমাকে দাও তোমাদের হাত
আমেরিকান রাত্রির রুক্ষ বেলাভূমির ওপার থেকেও
আমি যে তাদের স্পষ্ট দেখতে পাই
সংগ্রামে উদ্ধত অসংখ্য অগণন হাত।

রাত্রির অন্ধকারে
আমি আর কোনো নির্জনতাই অনুভব করি না।
আমি মানুষ, অগণিত মানুষ।
কণ্ঠস্বরে আমার অমিত শক্তি
যা নিস্তব্ধতাকে অতিক্রম করে
মুকুলিত হয়ে ওঠে রাত্রির অন্ধকারেও।
তুষার মৃত্যু দুঃখ ছায়ারা সহসা উধাও।
আর মানুষ যেন মৃত্যুলীন।
অথচ শস্যকণা মাটিতে ফিরে যায়।
তার দুর্মর আরক্ত বাহু
নৈঃশব্দ্য ভেঙে আকাশে উদ্ধত মাথা তোলে।
আর মৃত্যু থেকে আসে আমাদের নতুন জীবন।

তোমারই মধ্যে পৃথিবী

ছোট্ট
গোলাপ,
গোলাপের চেয়েও ছোট,
কখনও এত ছোট আর নগ্ন
যে
তুমি আমার হাতের মুঠোয়
বেশ ভালো ভাবেই মানিয়ে যাও,
তোমাকে আমি আঁকড়ে ধরে
বয়ে নিয়ে যাই আমার দু ঠোঁটের মাঝে,
অথচ
হঠাৎই
আমার পা স্পর্শ করে তোমার পায়ের পাতা
আমার মুখ তোমার উষ্ণ ঠোঁটে :
চকিতে তুমি বড় হয়ে ওঠো,
তোমার কাঁধ মাথা তুলে দাঁড়ায় উত্তুঙ্গ দুটো পাহাড়ি চূড়ার মতো,
তোমার স্তনভার ঘুরে বেড়ায় আমার বুকে,
আমার দু হাত কোনোরকমে জড়িয়ে ধরে
তোমার কটিতটের ক্ষীণ চান্দ্র-রেখা :
ভালোবাসায় তুমি নিজেকে সমুদ্রের জলের মতো আলগা করে দাও :
আকাশের সবচেয়ে দুর্লভ চোখগুলোর পরিমাপ আমি প্রায় করতে পারি না
বললেই চলে,
পৃথিবীকে চুমু দেবো বলে আমি তোমার মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ি।

সম্রাজ্ঞী

আমি তোমার নাম দিয়েছি সম্রাজ্ঞী।
কেউ তোমার চেয়ে দীর্ঘাঙ্গী থাকে তো, তুমি আরও দীর্ঘাঙ্গী।

কেউ তোমার চেয়ে পবিত্র থাকে তো, তুমি পবিত্রতম।
কেউ তোমার চেয়ে সুন্দর থাকে তো, তুমি আশ্চর্য সুন্দর।

কিন্তু তুমি আমার সেই একই সম্রাজ্ঞী।

তুমি যখন রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাও
কেউ তোমাকে চিনতে পারে না।
কেউ দেখতে পায় না তোমার স্ফটিকস্বচ্ছ মুকুট,
চোখেও পড়ে না তোমার দোর করে ফেরা
লাল আর সোনালী সুতোয় কাজকরা
অদৃশ্য গালচে।

তারপর তুমি যখন ফিরে আসো
সমস্ত নদী একই সঙ্গে গর্জন করে ওঠে
আমার বুকের মধ্যে,
ঘণ্টাধ্বনিতে কেঁপে ওঠে সারা আকাশ,
পবিত্র একটা স্তোত্র ভরিয়ে তোলে পৃথিবীকে।

কেবল আমি আর তুমি,
কেবল তুমি আর আমি তা শুনি,
প্রিয়তমা আমার।

তোমার পায়ের পাতা

আমি যখন তোমার মুখের দিকে তাকাতে পারি না
তখন তাকাই তোমার পায়ের পাতার দিকে।

তোমার সুন্দর ছোট ছোট দুটো পায়ের পাতা

যা বয়ে বেড়ায় তোমার নম্র দেহভার।

তোমার কটিদেশ, তোমার স্তন,
বৃন্তের আরক্তিম আভা,
তোমার চোখের চারপাশ
চকিতে উধাও হয়ে যায়,
উধাও হয়ে যায় তোমার অনন্য মুখ,
তোমার সোনালী কুন্তল,
আমার স্বপ্নের ছোট্ট মিনার।

অথচ আমি আশ্চর্য ভালোবাসি তোমার পায়ের পাতা,
কেননা ওরা সমুদ্র পৃথিবী বাতাস
আর জলের মধ্যে হেঁটে যায়,
কেবলই হেঁটে যায়
যতক্ষণ না খুঁজে পায় আমাকে।

কুমোর

লাবণ্যোচ্ছল তোমার সারাটা শরীর
আমার কাছে আশ্চর্য লোভনীয়।

যখন আমি ধীরে ধীরে হাত বোলাই
দেখি প্রতিটা জায়গাই এক একটা শ্বেত পারাবত
ব্যাকুল হয়ে যে আমাকে খুঁজছে,
তুমি যেন আমার কুমোরের নিজে হাতে গড়া
কাদার তৈরি, প্রিয়তমা আমার।

তোমার জানু, তোমার স্তন,

তোমার কটিদেশ
যেন আমার তৃষিত মাটির ভাঙা টুকরো,
ভেঙেও তারা যেন এক একটা
অবয়ব,
একসঙ্গে আমরা দুজনে
বিশাল একটা নদীর মতো
বালির ছোট্ট একটা কণার মতো সম্পূর্ণ।

বিস্মরণ

এ পৃথিবীর মতো বিস্তীর্ণ নীড়ের যত ভালোবাসা,
কাঁটা আর নক্ষত্রে ভরা যাকিছু প্রেম
সবই আমি তোমাকে দিয়েছি, অথচ তুমি
সবকিছু দু হাতে নিভিয়ে আগুনের ওপর দিয়ে হেঁটে চলে গেছো।

আঃ, ভালোবাসা কি বিশাল, প্রিয়তমা আমার !

সংগ্রাম থেকে আমি কখনও দূরে সরে দাঁড়াইনি।
শান্তি, সবার জন্যে রুটি, আর জীবনের মিছিলে
এগিয়ে যাওয়ার পথে
আমি কখনও থমকে পড়িনি,
বরং তোমাকে আমি তুলে ধরেছি দু হাতে
চুম্বনে চুম্বনে তোমাকে আমূল বিদ্ধ করেছি
রুদ্ধ করে দিয়েছি তোমার সারাটা মুখ,
তোমার দিকে এমন ভাবে তাকিয়েছি
যা এ পৃথিবীর কোনো মানুষ কোনোদিনও তোমার দিকে তাকাতে পারবে না।

আঃ, ভালোবাসা কি মহান, প্রিয়তমা আমার !

যে মানুষটা তোমার জন্যে দূরে সরিয়ে রেখেছিলো
রক্ত, ঘাম আর জল
তুমি তার গুরুত্ব কোনোদিনই উপলব্ধি করতে পারোনি,
তুমি তাকে ঘাঘরার প্রান্তে ছোট্ট একটা পতঙ্গের মতো
ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছো দূরে।

আঃ, ভালোবাসা কি গভীর, প্রিয়তমা আমার!

ভেবো না আমি দূর থেকে তোমার দিকে পেছন ফিরে তাকাবো,
তুমি যা ফেলে গেছো তার মধ্যে মুখ গুঁজে পড়ে থাকবো
কিংবা ঘুরে বেড়াবো আমার বিশ্বাসঘাতক আলোকচিত্রটার আশেপাশে;
দীপ্ত পায়ে আমি মিছিলে এগিয়ে যাবো
উন্মুক্ত করে দেবো ছায়া-ঢাকা যত প্রশস্ত রাজপথ,
মসৃণ করবো এ পৃথিবীর মাটি
যারা আসছে তাদের জন্যে বিছিয়ে দেবো সমস্ত নক্ষত্র।

রাত্রি নেমেছে। পথের ওপরেই তুমি দাঁড়িয়ে থাকো।
হয়তো ভোরে
আমাদের দুজনের আবার দেখা হবে।

আঃ, ভালোবাসা কি দুর্লভ, প্রিয়তমা আমার!

অতল গহ্বর

কখনও কখনও তুমি মুখ থুবড়ে পড়ো,
তলিয়ে যাও তোমার নিস্তব্ধতার অতল গহ্বরে
তোমার গর্বিত ক্রোধের গভীর জলরাশির মধ্যে,
যেখান থেকে আর কিছুতেই ফিরে আসতে পারো না,
তোমার অস্তিত্বের সেই গহন গভীরে

ভাঙাচোরা অবশিষ্টাংশ যা কিছু তখনও খুঁজে পাও, তাকে তুমি আঁকড়ে ধরো।

তোমার সেই রুদ্ধ গহ্বরে কি খুঁজে পাবে, প্রিয়তমা আমার —
সমুদ্রঝাঁঝি, পাঁক, নুড়ি-পাথর ?
তোমার অন্ধ চোখে কি দ্যাখো — ক্ষত-বিক্ষত তিক্ত হতাশা ?

প্রিয়তমা, তোমার সেই অতল গহ্বর থেকে
তুমি কোনোদিনই দেখতে পাবে না
তোমার জন্যে আমি কি সঞ্চয় করে রেখেছি :
সঞ্চয় করে রেখেছি শিশির-ভেজা জুঁইয়ের একটা তোড়া
আর তোমার সেই গহন জলরাশির চেয়েও গভীর একটা চুম্বন।

আমাকে তুমি ভয় পেও না, মনের মধ্যে
পোষণ কোরো না গভীর বিদ্বেষ।
আমার যে-কথাগুলো তোমাকে আহত করে
ওগুলোকে তুমি খোলা জানলা দিয়ে দূরে ছুঁড়ে ফেলে দাও.
নইলে পালটা আঘাতের জন্যে
ওগুলোই আবার ফিরে আসবে আমার নিরস্ত্র বুকে।

যদি আমার মুখ তোমাকে আহত করে
উজ্জ্বল হাসিতে তুমি ভরিয়ে দাও।
রূপকথার সেই রাখাল বালকের মতো আমি অত নম্র নই,
আমি একজন কাঠুরে, তোমার সঙ্গে ভাগাভাগি করে নিয়েছি
পৃথিবী, বাতাস আর এই বুনো পাহাড়ি গোলাপের কাঁটা।

আমাকে তুমি ভালোবাসো প্রিয়তমা,
আমার দিকে তাকিয়ে হাসো, আমাকে ভালো হবার সুযোগ দাও।
আমার মধ্যে তুমি নিজেকে আহত কোরো না, কেননা তা অর্থহীন,
আমাকে আঘাত করলে তুমি নিজেই আহত হবে।

বাঘ

আমি বাঘ।
ভিজে ধাতুর মতো চওড়া পাতার আড়ালে
আমি তোমার জন্যে অপেক্ষা করছি।

ঘন কুয়াশায় নদীটাকে ধবধবে সাদা দেখাচ্ছে।
ধীরে ধীরে তুমি এগিয়ে এলে,
সম্পূর্ণ নগ্ন।

চকিতে আমি জ্বলন্ত অগ্নিপিণ্ডের মতো
লাফিয়ে পড়লাম,
দাঁত আর রক্তাক্ত থাবায় ছিন্নভিন্ন করে দিলাম
তোমার স্তন, তোমার নিতম্বের নিটোল শুভ্রতা।

প্রতিটা অঙ্গপ্রত্যঙ্গ টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে
পান করলাম তোমার রক্ত।

তারপর থেকে
বছরের পর বছর
পাহাড়িয়া নদীর ওপারে
ক্রোধ আর ঘৃণা থেকে অনেক অনেক দূরে
গভীর অরণ্যে
বিরামবিহীন বৃষ্টির মধ্যে
তোমার নিশ্চল অস্থি-মজ্জার দিকে
আমি অপলক চোখে তাকিয়ে রয়েছি,
আমারই হত্যাপিপাসু ভালোবাসার নিষ্ঠুর প্রহরী।

পাহাড় আর নদী

সেই আমার দেশ যেখানে একটা পাহাড় আছে
আর আছে একটা নদী।

চলো না যাবে আমার সঙ্গে।

পাহাড়ের গা বেয়ে ওঠে অন্ধকার রাত্রি,
নদী বেয়ে নামে ভয়ংকর ক্ষুধা।

চলো না যাবে আমার সঙ্গে।

এতদিন যারা নির্যাতন সয়েছে কে তারা ?
আমি জানি না, অথচ ওরা আমাকে ডাকে।

চলো না যাবে আমার সঙ্গে।

আমি জানি না, অথচ ওরা আমাকে চেনে,
আমাকে ডেকে বলে : 'আমরা নির্যাতিত।'

চলো না যাবে আমার সঙ্গে।

ওরা আমাকে বলে : 'পাহাড় আর নদীর মাঝে
বুভুক্ষা আর যন্ত্রণায় কাতর
তোমার যে হতভাগ্য মানুষ
ওরা চায় না একা একা সংগ্রাম করতে,
বন্ধু, ওরা তোমার জন্যে অপেক্ষা করছে।'

লাল গমের ছোট্ট একটা কণা,
আঃ, তোমাকে কি ভালোটাই না বাসি

প্রিয়তমা আমার।

সংগ্রাম যত কঠিনই হোক না কেন
জীবন যত রুক্ষই হোক না কেন
তবু, তবু তুমি থাকবে আমার পাশে

দারিদ্র্য

আঃ, চরম দারিদ্র্যে
ক্ষতবিক্ষত তুমি,
তুমি চাও না জীর্ণ জুতো পরে বাজারে যেতে
এবং একই জীর্ণ পোশাকে আবার ফিরে আসতে।

প্রিয়তমা আমার, দুঃখকে আমরা
প্রশ্রয় দিই না,
যা হলে ধনীরা আমাদের পছন্দ করতো।
পোকায়-খাওয়া নষ্ট দাঁতের মতো দারিদ্র্যকে আমরা উপড়ে ফেলবো
এখনও যা মানুষের হৃদয়কে কুরে কুরে খাচ্ছে।

কিন্তু আমি চাই না
এ ব্যাপারে তুমি মিছিমিছি ভয় পাও।
যদি আমার ত্রুটির জন্যে তা প্রবেশ করে তোমার নীড়ে,
যদি দারিদ্র্য তাড়িয়ে নিয়ে ফেরে তোমার সোনালী জুতো,
তবু মুছে যেতে দিও না তোমার মুখের হাসি
যা আমার জীবনের একমাত্র পরম পাওয়া।
যদি তুমি ঘরের ভাড়া দিতে না পারো
যাও, গর্বিত পায়ে গিয়ে কাজ খোঁজো,
আর মনে রেখো, প্রিয়তমা আমার, অনুক্ষণ আমি তোমাকে চোখে চোখে রেখেছি,

জেনো আমরা দুজনে একত্রে এক দুর্লভ সম্পদ
যা এ পৃথিবীতে আর কোথাও কোনোদিনও সঞ্চয় করা হয়নি

জীবন

মাঝে মাঝে যখন তোমার কথা ভাবি
কি যে খারাপ লাগে !

যেহেতু তুমি জানো না
আমার সঙ্গে রয়েছে অগণন বিজয়ী মানুষের মুখ
যা তুমি দেখতে পাও না,
আমার সঙ্গে এগিয়ে চলেছে অগণন প আর হৃদয়,
তাই আমি একা নই
একা হিসেবে নিজের কোনো অস্তিত্বই নেই,
আমি কেবল রয়েছি যারা আমার সঙ্গে চলেছে তাদের পুরোভাগে,
তাই আমি দুর্বল নই
কেননা আমি কেবল আমার ছোট্ট জীবনটাকেই বহন করে নিয়ে চলিনি
চলেছি সমস্ত মানুষের হৃদয়কে বহন করে
এবং এগিয়ে চলেছি দৃঢ় পায়ে
কেননা আমার যে হাজারো চোখ.
নিমেষে আমি চূর্ণ করে ফেলি ভয়ংকর সব পাথর
কেননা আমার যে হাজারো হাত.
তাই আমার কণ্ঠস্বর
প্রতিটা দেশের সমুদ্রতীর থেকেও শোনা যায়
কেননা এ কণ্ঠস্বর
যারা কখনও কথা বলেনি তাদের,
যারা কখনও গান গায়নি তাদের,
আর আজ যারা গান গাইছে
চুম্বনে তারা তোমাকে স্পর্শ করছে।

কেতন

আমার সঙ্গে উঠে দাঁড়াও।

আমার চাইতে বেশি কেউ চায় না
বালিশে মুখ গুঁজে পড়ে থাকতে
যেখানে তোমার দুর্লভ আঁখিপল্লব
আমার জগৎটাকে সম্পূর্ণ রুদ্ধ করে দিতে চায়।
আমিও চাই তোমার স্নিগ্ধমধুর শ্যামলিমায়
নিজের উষ্ণ রক্তকে ঘুম পাড়িয়ে রাখতে।

তবু
তবু তুমি উঠে দাঁড়াও
উঠে দাঁড়াও আমার সঙ্গে
চলো দুজনে একসঙ্গে যাই
শয়তানদের চক্রান্তের বিরুদ্ধে
ক্ষুধাকে যা ভাগাভাগি করে দেয় সেই পদ্ধতির বিরুদ্ধে
সুসংগঠিত দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে
মুখোমুখি সংগ্রাম করতে।

চলো
দুজনে একসঙ্গে যাই
প্রিয়তমা, আমারই কাদা থেকে
নতুন করে জন্ম নেওয়া উজ্জ্বল নক্ষত্র আমার,
দেখো তুমি ঠিকই খুঁজে পাবে লুকনো বসন্ত
আর আগুনের ঝাপসা কুয়াশার মধ্যেও
তুমি থাকবে আমার পাশে,
তোমার দীর্ঘায়ত খ্যাপা চোখে
উড়বে আমার রক্তকেতন।

সৈনিকের ভালোবাসা

যুদ্ধের দিনগুলোতে জীবন তোমাকে বাধ্য করেছে
সৈনিকের প্রেমিকা হতে।

জীর্ণ রেশমী পোশাকে
ঝুটো মুক্তোর মালায়
তুমি বাধ্য হয়েছো আগুনের মধ্যে দিয়ে হেঁটে যেতে।

এসো মুসাফির
আমার বুকে এসো,
পান করে যাও লাল শিশির।

তুমি জানতে চাওনি কোথায় তুমি যাচ্ছো,
তুমি ছিলে কেবল নাচের সঙ্গী,
তোমার ছিলো না কোনো সংস্থা, না কোনো দেশ।

আর এখন আমার পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে
তুমি দেখলে আমার সঙ্গে চলেছে জীবন
আর আমাদের পেছনে মৃত্যু।

তোমার এই জীর্ণ রেশমী পোশাকে
এখন তুমি আর কিছুতেই নাচঘরে নাচতে পারো না।

তোমার পায়ে জুতো থাক বা না থাক
এখন তোমাকে সামনে এগিয়ে যেতেই হবে।

এখন তোমাকে এগিয়ে যেতে হবে কাঁটার ওপর দিয়েই
পেছনে পড়ে থাকবে কেবল ফোঁটা ফোঁটা রক্তের চিহ্ন।

আর একটা চুম্বন দাও, প্রিয়তমা আমার।

কমরেড, রাইফেলগুলো এবার পরিষ্কার করো।

আগুন কেবল

হ্যাঁ, আমার স্পষ্ট মনে পড়ে
গাঢ় আলো-ছায়ায় ভরে ওঠা তোমার বন্ধ চোখের পাতা,
তোমার সারাটা শরীর যেন একটা নগ্ন বাহু,
যেন ফুটফুটে জ্যোৎস্নার নিপুণ কারুকার্য,
আর বিপুল উল্লাসে আমরা ভরে উঠি
যখন বিদ্যুতের একটা ঝলক আমাদের স্থবির করে দেয়,
যখন ছুরির তীক্ষ্ণ একটা ফলা শেকড় থেকে আমাদের বিচ্ছিন্ন করে ফেলে
আর আলোর কোমল রেখাগুলো এসে পড়ে আমাদের চুলে,
তারপর একটু একটু করে আমরা আবার
জীবনে ফিরে আসি,
যেন জাহাজডুবির পর রুক্ষ পাথর আর আগাছার মধ্যে দিয়ে
আমরা ধীরে ধীরে সমুদ্র থেকে উঠে আসি।

অথচ
কেবল ফুল নয়
পথ চলতে চলতে অন্য স্মৃতিগুলোও
চকিতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মতো
ভেসে ওঠে।

আমি দেখি
তুমি আমার ময়লা রুমালগুলো পরিষ্কার করছো,
জীর্ণ মোজাগুলো শুকতে দিচ্ছো জানলায়

আর সবকিছুই তোমার হাতের স্পর্শে যেন চমকে উঠছে।
প্রাত্যাহিক জীবনের
ছোট্ট প্রিয়তমা আমার,
ভালোবাসার ভস্মে গলে যায় যে গোলাপ
তুমি তার কোমল পাপড়ি নও,
তুমি যেন
এ জীবনের সব—
সাবান, সোডা আর ছুঁচ নিয়ে যে জীবন,
রান্নাঘরের যে গন্ধ আমি ভালোবাসি
যা হয়তো আমরা আর কোনোদিনই ফিরে পাবো না,
তবু তার মধ্যে তোমার মানবিক হাতের স্পর্শ,
যতদিন না ঝলসানো গ্রীষ্ম আসে
শীতে গাওয়া তোমার গান
এ পৃথিবীতে সেই যেন আমার চিরবসন্ত।

আঃ, জীবন
আগুন কেবল আমাদের দুজনকেই
জ্বালিয়ে পুড়িয়ে শেষ করে দেয় না,
শেষ করে দেয় জীবনের সবটুকু
সাধারণ যত কাহিনী,
আর পাঁচজনের মতো নিতান্তই সাধারণ একজন
স্ত্রীপুরুষের নিবিড় ভালোবাসা।

প্রিয়তমা

হঠাৎ করেই তুমি যদি আর না থাকো
হঠাৎ করেই তুমি যদি মারা যাও,
তবু আমাকে বেঁচে থাকতে হবে

প্রিয়তমা।
কেননা যেখানে মানুষের কোনো কণ্ঠস্বর নেই
সেখানে সোচ্চার হয়ে উঠবে আমার কণ্ঠস্বর !
যেখানে কৃষাঙ্গরা পড়ে পড়ে মার খায়
সেখানে আমি কোনোদিনই মরতে পারি না।
আমার ভাই-বন্ধুরা যখন জেলখানায় যায়
আমিও যাই তাদের সঙ্গে।

সংগ্রামে
মানুষ যেদিন জয়ী হবে,
অন্ধ হলেও আমি তাকে স্পষ্ট দেখতে পাবো
মূক হলেও সেদিন উদ্বেল হয়ে উঠবে আমার কণ্ঠস্বর।

না, ক্ষমা করো আমাকে।
যদি তুমি আর না থাকো,
যদি তুমি
মারাই যাও, প্রিয়তমা আমার,
প্রতিটি পাতা খসে খসে পড়বে আমার বুকের ওপর
রাত্রিদিন আমার সমস্ত সত্তা জুড়ে ঝরবে অবিরাম বৃষ্টিপাত
তুষারে জ্বলে যাবে সারাটা হৃদয়,
হিমেল তুষার, আগুন আর মৃত্যু মাড়িয়ে আমি হেঁটে যাবো,
আমার ক্লান্ত পাদুটো গিয়ে পেঁছিবে যেখানে তুমি ঘুমিয়ে আছো,
অথচ
আমাকে বেঁচে থাকতে হবে প্রিয়তমা,
কেননা তুমিই চেয়েছিলে, আর কিছু না হোক
আমি যেন কখনও বশ্যতা না মানি,
তাছাড়া তুমি তো খুব ভালো করেই জানো প্রিয়তমা আমার
আমি কেবল একটা কোনো মানুষ নই
আমি যে তামাম এ দুনিয়ার সমস্ত মানুষ।

ছোট্ট আমেরিকা

মানচিত্রে যখন তোমার অবয়বটার দিকে তাকাই আমেরিকা,
দেখি তোমার কপালে পুঞ্জ পুঞ্জ তামা,
গম আর তুষারে ছেয়ে আছে তোমার স্তনভার,
শীর্ণ কটিদেশে ছুঁয়ে নেচে যাচ্ছে যত খরস্রোতা তটিনী,
পাহাড় আর সবুজ শ্যামলী প্রান্তর,
দক্ষিণের হিমেল তুষারে যেখানে পৌঁচেছে তোমার পায়ের পাতা
সোনায় সোনা হয়ে রয়েছে সারাটা অঞ্চল।

প্রিয়তমা, যখনই তোমাকে স্পর্শ করি
কেবল আমার হাত নয়—ফল আর শাখা,
মাটি আর জলও যেন বিপুল উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়ে ;
আমি ভালোবাসি তোমার উজ্জ্বল বসন্ত. নিঃসঙ্গ চাঁদ,
বুনো ঘুঘুর কবোষ্ণ বুক, নদী কিংবা সমুদ্রের জলে
ক্ষয়ে যাওয়া মসৃণ উপল,
যেখানে ক্ষুধা আর তৃষ্ণা ওত পেতে থাকে
সেই ঘন কাঁটার ঝোপ।
এমনি ভাবেই তুমি আমাকে তোমার শরীরে আহ্বান জানাও
ছোট্ট আমেরিকা, আমার স্বপ্নের এক দুর্লভ দেশ।

তুমি যখন শুয়ে থাকো
আমি দেখি পাকা যবের মতো তোমার শরীরেব রঙ,
ঠিক যেন আমার ভালোবাসার দেশের মানুষেরই মতো কৃষ্ণাঙ্গ আর মসৃণ।
কেননা তোমার কাঁধ ছাপিয়ে জ্বলন্ত কিউবার
ঘামে ভেজা আখ-শ্রমিকরা আমার দিকে তাকিয়ে থাকে,
তোমার গ্রীবার চারপাশ ঘিরে
সমুদ্রতীরের ছোট ছোট কুঁড়েতে বাস করা জেলেরা
আমারই কাছে তাদের দুঃখের গান গায়।
তাই তোমার প্রিয় অতনু দেহরেখা, তোমার উজ্জ্বল লাবণ্য

কেবলই আমাকে ডেকে নেয়, ছোট্ট আমেরিকা,
তোমার জীবনের সঙ্গে আমার জীবন
তোমার ভালোবাসার সঙ্গে আমার ভালোবাসা
মিশে একাকার হয়ে যায় সুদীর্ঘ একটি চুম্বনে।

পোশাকের গান

প্রতিদিন সকালবেলায়
তুমি চেয়ারের ওপর অপেক্ষা করো,
আমার অহঙ্কার
আমার ভালোবাসা
আমার আকাঙ্ক্ষা
আমার শরীর তোমাকে ভরিয়ে তুলবে বলে।
ঘুম ভেঙে জেগে উঠেই
আমি জলকে বিদায় জানাই,
তারপর
তোমার হাতার মধ্যে প্রবেশ করি,
আমার পা তোমার পায়ের গর্তদুটো খুঁজে বার করে
এমনি ভাবে তোমার ক্লান্তিহীন বিশ্বস্ততায়
নিজেকে নিবিড় করে জড়িয়ে
আমি প্রাতঃরাশ সারতে বেরুই,
কবিতার পরিমণ্ডলে ঘুরে বেড়াই,
জানলা দিয়ে সবকিছু তাকিয়ে তাকিয়ে দেখি
নারী পুরুষ
তৎপরতা আর সংগ্রাম
আমাকে ভাবায়,
আমাকে ক্ষিপ্ত করে তোলে,
আমার হাতদুটোকে ব্যস্ত রাখে

আমার চোখ খুলে দেয়
আমার মুখে এনে দেয় আস্বাদন,
তাই
পোশাক
তুমি যা
আমি তোমাকে তাই-ই বানিয়ে তুলি,
হাতাগুলোকে গুটিয়ে ফেলি
সেলাইয়ের মুখগুলোকে দাঁত দিয়ে ছিঁড়ি
আর এমনি ভাবে
তোমার জীবন আমার জীবনের কল্পনাকেও
ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে তোলে।
বাতাসে তুমি অসহ্য চিৎকার করে ওঠো
যেন তুমি আমার নিজেরই সত্তা,
বিশ্রী সব মুহূর্তগুলোতে
জড়িয়ে থাকো আমার হাড়ের সঙ্গে,
অন্ধকার নিঃসঙ্গ রাতে
ঘুম
মানুষ
ছায়া
আর তোমার ডানা
সব একাকার হয়ে যায়।
মাঝে মাঝে ভাবি
হয়তো কোনদিন শত্রুর বুলেট
আমার রক্তে তোমাকে ভিজিয়ে দেবে
আর সেদিন
আমার সঙ্গে তুমিও মরে যাবে
কিংবা
ব্যাপারটা এমন নাটকীয় না হয়ে
হয়তো আরও সহজও হতে পারে,
আমার সঙ্গে আমার দেহের সঙ্গে অসুস্থ হয়ে

আমরা দুজনেই একসঙ্গে
গোরে যেতে পারি।
এইসব কথা মনে রেখেই
আমি তোমাকে প্রতিদিন আন্তরিক অভিবাদন জানাই
আর তুমিও আমাকে জড়িয়ে ধরো নিবিড় আলিঙ্গনে,
আমি ভুলে যাই তোমার কথা
কেননা আমরা দুজনেই তো এক,
আমরা দুজনে একসঙ্গে
বাতাসের দিকে মুখ করে এগিয়ে যাবো,
রাত্তিরে রাস্তায় এমন কি সংগ্রামেও
আমরা দুজনে অভিন্ন,
তারপর
একদিন
আমরা দুজনে
একই সঙ্গে নিশ্চল হয়ে যাবো।

মোজার গান

মারু মোরি নিজে
তার ভেড়া-চরানো হাতে
আমার জন্যে
একজোড়া
মোজা বুনে দিয়েছিলো,
মোজাদুটো ঠিক
খরগোশের পিঠের মতোই নরম।
আমি যখন তার মধ্যে
পা ঢোকাই
মনে হয়

যেন ভেড়ার চামড়ার ওপর
গোধূলি-আলোর রাঙা সুতো দিয়ে বোনা
একজোড়া ঝাঁপির মধ্যে
পা ঢুকিয়েছি,
আর পাদুটোকে তখন
মনে হতো
ঠিক যেন
পশমের তৈরি দুটো মাছ,
সমুদ্র-নীল দুটো হাঙর
কিংবা কালো
ডানামেলা দুটো পাখি।
এমনি ভাবেই
আশ্চর্য সুন্দর দুটো মোজার দৌলতে
আমার পাদুটো
সম্মানিত হয়ে উঠতো।
সত্যি
মোজাদুটো
এমন চমৎকার
প্রথম প্রথম মনে হতো
পাদুটো বুঝি
আমার নিজের নয়।
সব সময়
আমি আপ্রাণ চেষ্টা করতাম
মোজাদুটোকে
সযত্নে
কোথাও লুকিয়ে রাখতে,
ছোট্ট বাচ্চারা যেমন
সন্তর্পণে লুকিয়ে রাখে জোনাকি,
আগাধ পণ্ডিত ব্যক্তিরা যেমন
সংগ্রহ করে দুর্লভ

পড়োয়,
তেমনি ভাবে
আমারও ভীষণ লোভ হতো
মোজাদুটোকে সোনার খাঁচায়
তুলে রাখি,
প্রতিদিন তাকে ঘাসের বীজ
কিংবা টুকটুকে লাল
একটুকরো তরমুজ খেতে দিই।
গভীর জঙ্গলে
শিকারীরা যেমন
অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য ধরনের কোনো সবুজ হরিণ মেরে
খেতে বাধ্য হয়,
মাঝে মাঝে
আমিও তেমনি বাধ্য হই
ওই আশ্চর্য সুন্দর দুটো মোজার মধ্যে
পা ঢোকাতে,
তারপর
আমার জুতোর মধ্যে।

আমার এই গানে
আসল যে কথাটা বলতে চাই
তা হলো :
মোজাদুটো
শুধু সুন্দর নয়
দ্বিগুণ সুন্দর,
শুধু ভালো নয়
সত্যিই
দ্বিগুণ ভালো,
বিশেষ করে
শীতের দিনে

যখন কারুর নিপুণ হাতে
পশম দিয়ে বোনা।

আমি চাই নিস্তব্ধতা

এখন ওরা আমাকে ভরা শান্তিতে রেখে গেলো,
এখন ওরা আমার অনুপস্থিতিকে সহ্য করে নিয়েছে।

এবার আমি চোখ বুজতে যাচ্ছি।

আমি চাই কেবল পাঁচটা জিনিস,
বাছাই-করা পাঁচটা শেকড়।

এক, সীমাহীন ভালোবাসা।

দুই, শরৎ।
পাতা ঝরা আর পাতা উড়ে যাওয়া ছাড়া
এ পৃথিবীতে আমার বেঁচে থাকাটাই অর্থহীন।

তিন, শান্ত সমাহিত শীত।
আমি ভালোবাসি বউ-নাচুনী বৃষ্টি
আর অসম্ভব শীতে আগুনের কোমল স্পর্শ।

চার, গ্রীষ্ম।
গোলগাল মসৃণ তরমুজের মতো নিটোল গ্রীষ্ম।

আর সবশেষে, তোমার চোখদুটো।
মাতিলদা, প্রিয়তমা আমার,

তোমার দু চোখের ঘন পল্লব ছাড়া আমি কিছুতেই ঘুমতে পারি না
তোমার দু চোখের আয়ত দৃষ্টি ছাড়া আমি কিছুতেই বাঁচতে পারি না।
এমন কি আমি বসন্তের সাথেও সন্ধি করতে পারি
যদি তোমার চোখদুটো অনুক্ষণ আমাকে আগলে রাখে।

প্রিয় বন্ধুরা আমার, কেবল এইটুকুই চাই,
আর কিছু নয়, এই-ই আমার সব চাওয়ার শেষ।

এখন ওরা ইচ্ছে করলে যেতে পারে।

এত দীর্ঘদিন আমি এ পৃথিবীতে বেঁচেছি
যে একদিন আমাকে ভুলতে ওদের রীতিমতো মনের জোর লাগবে,
কালো পাথরের বুক থেকে মুছে ফেলতে হবে আমার নাম।
কেননা আমার হৃদয় যে দুর্মর।

কিন্তু যেহেতু আমি নিস্তব্ধতা চাই
তার মানে আদৌ এই নয় যে আমি মরতে চাই।
বরং ঠিক তার উলটোটাই সত্যি,
আমি অবিরাম ছুটে চলেছি জীবনের স্রোতে।

স্ফুরিত হওয়া, ক্রমাগত স্ফুরিত হয়ে ওঠা।

কিন্তু তা কোনোদিনই সম্ভব নয়, যদি না আমার মধ্যে
অঙ্কুরিত হয়ে ওঠে শস্যের কণা,
আলোয় পৌঁছবে বলে যে
ফাটিয়ে চৌচির করে দেয় মাটি।
অথচ জননী বসুন্ধরার বুক জুড়ে অন্ধকার,
অন্ধকার আমারও সত্তার গভীর গহন জুড়ে।
আমি হচ্ছি সেই কুপ
যার জলে নক্ষত্রপুঞ্জকে ফেলে রেখে

রাত্রি একা একাই নিঃসঙ্গ প্রান্তর পেরিয়ে চলে যায়।

অবশ্য এটা হচ্ছে
গভীর থেকে আরও গভীরতর ভাবে বেঁচে থাকার প্রশ্ন

আমার কণ্ঠস্বর যে এমন স্বচ্ছ ছিলো
কোনোদিনই তা অনুভব করিনি,
চুম্বনে এমন ঐশ্বর্যময় কোনোদিনই ছিলুম না আমি।

বরাবরের মতো, এখনও সেই নিশান্তিকা
একঝাঁক মৌমাছির মতো গুঞ্জরিত আলো

এমন দিনে আমাকে একা থাকতে দাও।
ছুটি নিচ্ছি—আবার নতুন করে জন্ম নেবো বলে।

আমরা দুজনে

যদিও সময়টা বিশেষ সুবিধের নয়, তবু আমার জন্যে অপেক্ষা করো
আমরা দুজনে আবার জাঁকিয়ে বাঁচবো।
তোমার ছোট্ট নরম হাতদুটো আমাকে দাও,
আমরা আবার উঠে দাঁড়াবো, দুঃখ-কষ্টকে বরণ করে নেবো
সবকিছু অনুভব করবো আর বিপুল উল্লাসে ভরে উঠবো।

আমরা সেই রকমই একটা জুটি
যারা হাটেমাঠে যেখানে সেখানে বাস করেছি,
এমনকি পাহাড়ের রুক্ষ ফাটলেও নীড় বেঁধেছি।
যদিও সময়টা বিশেষ সুবিধের নয়,
তবু তোমার ঝুড়ি শাবল জুতো আর জামাকাপড় সঙ্গে নিয়ে

আমার জন্যে অপেক্ষা করো।

এখন আমাদের দুজনের পরস্পরকে বিশেষ প্রয়োজন,
কেবল সুগন্ধি কারনেশনের জন্যেও নয়
কিংবা মধু সংগ্রহের জন্যেও নয়—
আমাদের দুজনের হাতগুলোর প্রয়োজন
ধুয়ে মুছে আগুন বানাবার কাজেও।
তাই বিশেষ-সুবিধের-নয় এই যে সময়টা
যত উঁচুতেই মাথা তুলুক না কেন,
চার হাত আর চার চোখে আমরা তার মোকাবিলা করবোই।

মাতাল আর জলপরীর কাহিনী

প্রায় সম্পূর্ণ নগ্ন হয়ে ও যখন পানশালার ভেতরে প্রবেশ করলো
বেহেড মাতালগুলোর সবাই তখন ছিলো সেখানে।
মাতালগুলো বেদম মদ গিলছিলো আর ওর গায়ে থুতু ছেটাচ্ছিলো।
ও সবে সাগর থেকে উঠে এসেছে,
তাই ওদের ব্যাপার-স্যাপার সে কিছুই বুঝতে পারলো না।
আসলে জলপরীটা পথ ভুলেই ওখানে ঢুকে পড়েছে।
মাতালদের তীক্ষ্ম ঠাট্টাবিদ্রূপগুলো পিছলে পিছলে পড়ছে
ওর মসৃণ ত্বকের ওপর দিয়ে,
অশ্লীলতায় ভিজে যাচ্ছে সোনালী বুকদুটো।
কান্না কি জিনিস জানে না বলেই ও কাঁদতে পারছে না,
সাজ-পোশাকের ব্যাপারটা জানা নেই বলেই ও কিছু পরেনি।
মাতালগুলো জ্বলন্ত সিগারেটের টুকরো
আর মদের বোতলের ছিপিগুলো ছুঁড়ে ছুঁড়ে মারছে ওর দিকে,
হাসতে হাসতে লুটিয়ে পড়ছে মেঝেতে।
জলপরীটা একটা কথাও বলেনি, কেননা কথা বলতে ও জানে না।

ওর দুরোন্নত চোখে তখন গাঢ় হয়ে বসেছে রঙিন ভালোবাসা
আর হাতগুলো নীলকান্তমণির মতো আশ্চর্য মসৃণ।
প্রবালের আলোয় ওর ঠোঁটদুটো একবার মৃদু কেঁপে উঠলো,
তারপর ও নিঃশব্দে ঘর ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে এলো।
সোজা গিয়ে পড়লো সমুদ্রে।
ওকে তখন ঠিক বৃষ্টিতে ভেজা পাথরের মতো আশ্চর্য উজ্জ্বল দেখাচ্ছিলো,
ও কিন্তু একবারও পেছন ফিরে তাকায়নি, সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়েই
সোজা সাঁতরে গেলো মৃত্যুমুখী কোন অতল শূন্যতার দিকে।

শহরে ফেরা

আমি ওদের শুধাই—কেমন করে এখানে এলুম,
কে-ই বা আমি একা এই নিষ্প্রাণ জনারণ্যে ?

একদিন যে মেয়েটা আমাকে পাগলের মতো ভালোবাসতো
তাদের বাড়ির ছাদ কিংবা রাস্তাঘাট কিছুই খুঁজে পাচ্ছি না

গাছের শাখায় ঝোড়ো কাক, সবুজ বৃষ্টির ধারা
ক্ষয়ে-যাওয়া রাস্তায় পানের পিক
ভারি বাতাস—সবই নিঃসন্দেহে চেনা চেনা লাগছে,
কিন্তু এ আমি কোথায় ? কে আমি,
আগেই বা কোথায় ছিলুম ?
স্তূপাকার ভস্মরাশি ছাড়া আর কিছুই চিনতে পারছি না।

পানওয়ালাটা অবাক চোখে আমার দিকে তাকায়,
না চিনতে পারে আমার জুতোজোড়া
না সাম্প্রতিক বেঁচে-ওঠা আমার মুখের আদল।
হয়তো ওর ঠাকুরদা আমাকে চিনতে পারতো

চাই কি সেলামও বাজাতো একটা,
কিন্তু এমনই দুর্ভাগ্য
আমার প্রবাসকালেই বুড়ো মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছে।

যে বাড়িতে চোদ্দ মাস, এমন কি তার পরের বছরগুলোও কাটিয়েছি,
লিখেছি নিজের জীবনের চরমতম দুঃখ-দুর্দশার কথা,
এখন তার পাশ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছি
অথচ দরজাটা খুঁজে পাচ্ছি না।
বৃষ্টি পড়ে চলেছে অবিরাম।

এখন মনে হচ্ছে আমি কোনোদিনই বিশেষ একটা মানুষ ছিলুম না
ছিলুম বহু, মরেছিও বহুবার,
অবশ্য কেমন করে আবার জন্ম নিয়েছি
সে সব আর কিছু মনে নেই।
এ যেন পোশাক পালটে
আমাকে অন্য জীবন যাপন করাতে বাধ্য করা হয়েছে,
আর আমি এখানের কাউকে চিনতে পারছি না,
ওরাও কেউ আমাকে চিনতে পারছে না,
যেন এখানের সবাই মৃত
আর এই অজস্র বিস্মৃতির মাঝে কেবল আমি একাই বেঁচে রয়েছি,
অথচ তখনও বেঁচে থাকা একটা পাখি
আর শহরটা আমাকে লক্ষ্য করছে,
বুঝতে পেরেছে আমি অনেক অনেক আগেই মরে গেছি।

রেশম-পট্টি, দুঃখের বাজার ঘুরে ঘুরে বেড়ালুম
আগের রাস্তাঘাট কিছুই চিনতে পারলুম না,
পেরেকের মতো কঠিন কুচকুচে কালো চোখগুলো
আমার চোখের দিকে অপলক তাকিয়ে রইলো,
এমন কি যার চোখ নেই, হাত নেই, প্রদীপের কোনো বালাই-ই নেই
সেই বিবর্ণ স্বর্ণ-বৌদ্ধবিহারটাও আমার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলো।।

তাহলে বিদায়, সময়ের প্রলেপে জীর্ণ পথঘাট,
বিদায়, হারানো প্রেম আমার, বিদায়।
আমি ফিরে যাই আমার ভাঁড়ারে মদের বোতলটার কাছে
আমার প্রিয়তমার ভালোবাসার কাছে,
আমি যা ছিলুম, যা হয়েছি—তার কাছে
সূর্য, জল, আর পাকা আপেলের মতো পুরনো পৃথিবীটার কাছে
ঠোঁট আর নাম বহুল সেইসব মুখগুলোর কাছে।
আর কখনও ফিরে আসবো না বলেই আমি ফিরে যাই,
আর কখনও এমন নিজেকে বিপথে ঠেলবো না।

পিছু-পথে হাঁটা সত্যিই বিপজ্জনক,

কেননা অতীত যে কোনো মুহূর্তে হয়ে যেতে পারে বন্দীকারা।

ঘোড়াগুলো

জানলা থেকে ঘোড়াগুলোকে দেখেছিলুম।

তখন শীতকাল, আমি ছিলুম বার্লিনে। আলো ছাড়া
খানিকটা আলো তখনও জড়িয়ে ছিলো আকাশ ছাড়া আকাশের গায়ে।

কুয়াশা জড়ানো স্যাঁতস্যাঁতে ভিজে পাতার মতো সাদা বাতাস।

আমার জানলা থেকে শুধু চোখে পড়ে
দুর্জয় শীতের কামড়ে হিহি করে কাঁপা নির্জন প্রাঙ্গণের বৃত্তটা।

হঠাৎ, কেবলমাত্র একজন সহিসের তদারকিতেই
সেই বরফজমা চত্বরে বেরিয়ে এলো দশটা ঘোড়া।

দীপ্ত শিখার মতো ওরা বেরিয়ে আসতে না আসতেই
ভরিয়ে দিলো আমার চোখের সবটুকু আকাশ,
এতক্ষণ যা ছিলো সম্পূর্ণ ফাঁকা। স্বপ্নে দেখা
কল্পনার মতো কেশর দুলিয়ে, দৃঢ় পায়ে
ওরা এসে দাঁড়ালো, যেন দীপ্যমান নিষ্কলঙ্ক দশটি দেবতা।

কমলালেবুর মতো গোলগাল পাছা,
গায়ের রং যেন কাঁচা সোনার ঢালা পদ্মের মধু।

মিনারের মতো উদ্ধত গ্রীবা, ঠিক যেন পাথরে কোঁদা,
গর্বিত চোখে পুঞ্জ পুঞ্জ তেজ অবরুদ্ধ বন্দীর মতো ফুঁসছে।

সেখানের সেই নিটোল নিস্তব্ধতায়, বিশ্রী
অসন্তোষভরা শীতের মধ্যনিদাঘে
ঘোড়াগুলো নিয়ে এলো রক্তের তাজা টগবগানি,
প্রাণ-প্রাচুর্যে ফেটে.পড়ার দীপ্ত ইঙ্গিত।

বারবার দেখেও যেন চোখ ভরে না,
আমি উদ্দীপ্ত হয়ে উঠি।
উৎক্ষিপ্ত ফোয়ারা, স্বর্ণিল বর্ণের প্রাণচঞ্চলতা, আকাশ আর আগুন
সুন্দর বাকিছু সবই যেন আশ্চর্য জীবন্ত হয়ে ওঠে।

ভুলে গেছি বার্লিনের সেই বিষণ্ন শীতের কথা।

অথচ ঘোড়াগুলোর সেই উচ্ছল প্রাণচঞ্চলতা কোনোদিনও ভুলতে পারবো না।

নিশ্চুপ

আমরা এখন এক থেকে বারো পর্যন্ত গুনবো
তারপর আমরা সবাই চুপ করে থাকবো।
অন্তত একবারের জন্যে আমরা কেউ
এ পৃথিবীর কোনো ভাষাতেই কথা বলবো না,
পলকের জন্যে আমরা সবাই স্তব্ধ হয়ে থাকবো,
আমাদের হাতগুলো অত জোরে জোরে নাড়বো না।

সেটা হবে একটা দারুণ অজানা মুহূর্ত
যখন কোথাও কোনো মানুষের ভিড় থাকবে না, না ইঞ্জিনের গর্জন,
অদ্ভুত একটা রহস্যময়তার মধ্যে
আমরা সবাই চুপচাপ পাশাপাশি দাঁড়িয়ে থাকবো।
সুদূর হিমেল সমুদ্রে জেলেরা তিমিদের বিরক্ত করবে না,
নুন সংগ্রহকারী মানুষেরা
তাকিয়ে থাকবে তাদের ক্ষতবিক্ষত হাতের দিকে।

গ্যাস আর আগুন নিয়ে যারা
বিজয়ের স্মৃতিচিহ্নবিহীন সবুজ যুদ্ধের প্রস্তুতি নিয়েছিলো
পরিষ্কার জামা-কাপড় পরে তারা ভায়েদের সঙ্গে
পার্কের ছায়ায় ছায়ায় ঘুরে বেড়াবে।

আমি যা চাই সম্পূর্ণ স্থবিরতার সঙ্গে তাকে
কিছুতেই গুলিয়ে ফেলা উচিত নয়।
জীবন যে রকম ঠিক তেমনিই থাকবে,
মৃত্যুর সঙ্গে আমি কোনোকিছু বিনিময় করতে চাই না।

নিজেদের জীবনগুলোকে সচল রাখার জন্যে
যদি আমরা এমন তন্ময় না হতাম,
অন্তত আর একবারের জন্যে যদি কিছু না করতাম,

হয়তো বিশাল একটা নিস্তব্ধতা
নিজেদেরকে কোনোদিন বুঝতে-না-পারার
কিংবা মৃত্যুভয়ে কুঁকড়ে-ছোট-হয়ে-যাওয়ার বিষণ্ণতাকে
ভেঙে চুরমার করে দিতে পারতো।
সবকিছু যখন মৃত আর মৃত্যু নিজেই যখন আশ্চর্য উদ্দীপ্ত
হয়তো তখন কেবল
এ পৃথিবীই ফিরে আমাদের শিক্ষা দিতে।
আমি এখন এক থেকে বারো পর্যন্ত গুনবো
আর তোমরা সবাই নিশ্চুপ হয়ে থাকবে,
তারপর আমি চলে যাবো।

৬

আমাকে যে দারুণ ভালোবাসতো
সেই মৃত ছুতোর বন্ধুর জন্যে আমার সত্যিই খুব কষ্ট হয়।
আমরা দুজনে একসঙ্গে একই টেবিলে কাজ করেছি
রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়িয়েছি,
যুদ্ধের সময় দুঃখের দিনগুলোতে আমরা ছিলুম অভিন্ন।
হাড় কখানা শুধু চামড়ায় ঢাকা হলে কি হবে
ও ছিলো ভারি আমুদে আর ওর সেই উজ্জ্বল হাসিটা
আমার কাছে ছিলো একটুকরো রুটির মতোই সমান মূল্যবান।
একদিন হঠাৎ করেই আমাদের দুজনের দেখাশোনা বন্ধ হয়ে গেলো,
ও মুখ থুবড়ে পড়লো মাটিতে।

সেদিন থেকে সেইসব মানুষ, বেঁচে থাকার সময়ে
যারা এতদিন ওকে কোণঠাসা করে রেখেছিলো,
আজ তাকে সুন্দর পোশাক আর ফুল দিয়ে সাজিয়ে দিলো,
যেন ওর মৃত্যুকেই অস্বীকার করতে চাইলো,

নিজেদের ধারালো তীক্ষ্ণ কাঁটা দিয়ে
মৃতের হাত সুসজ্জিত করে বললো আমাকে খুন করতে,
যাতে সবাই বুঝতে পারে আমার চেয়ে ওদের দুঃখ কত গভীর।

এ কাহিনী শোনানোর জন্যে আজও আমি কাউকে খুঁজি
কিন্তু আমার এ দুঃখ, এই নিঃসীম তিক্ততা কেউ বুঝতে পারে না।
আজ ও মৃত, এবং আমি কাউকেই খুঁজে পাইনি
যাকে বলতে পারি ওরা সফল হয়নি
কোনোদিনও হবে না—
এমন কি মৃত্যুর দেশেও ও ওর কাজ দিয়ে নিজেকে পূর্ণ করেছে,
আর আমি আমার শ্রম দিয়ে।
আমরা দুজনে নিতান্তই গরীব ছুতোর,
জীবনে, এমন কি মৃত্যুতেও
আমরা আমাদের সম্মানকে অক্ষুণ্ণ রেখেছি।

শৈশব থেকে তার পা

এটাও যে পা—শিশুর পা এখনও সে সম্পর্কে সচেতন নয়
তার পা হতে চায় একটা আপেল, নয়তো কোনো প্রজাপতি।

অথচ যখন সময় হবে—নুড়ি, পাথর, কাচের টুকরো
রাস্তাঘাট, মই আর কাঁকর-বিছনো পথগুলোই তাদের চিনিয়ে দেবে
পা কখনও উড়তে পারে না
কিংবা গাছের শাখায় কোনো ফলের মতো ঝুলে থাকতে পারে না।
তখনই শিশুর পা হার মানে,
মাটিতে পড়ে যায়,
তবু জুতোর মধ্যে বাস করতে অস্বীকার করা
বন্দীর মতো সংগ্রাম করে।

তারপর একটু একটু করে অন্ধকারে
আপনা থেকেই তার নিজের পৃথিবীটাকে চিনে নিতে শুরু করে,
অন্তরঙ্গ কোনো বন্ধুর স্পর্শ ছাড়াই ঠিক যেমন কোনো অন্ধ মানুষ
তার নিজের জীবনকে উপলব্ধি করে।

গুচ্ছ গুচ্ছ স্ফটিকের মতো স্বচ্ছ, কোমল নখগুলো
ক্রমশ শক্ত হতে থাকে, মোষের শিংএর মতো কঠিন,
ছায়াময় বস্তুতে ওরা নিজেদেরকে বদলে নেয়,
আর গোলাপের ঝরা পাপড়ির মতো
শিশুর ছোট ছোট গোড়ালিগুলো
এলোমেলো অপরিচ্ছন্ন হয়ে যায়।
শেষে কড়া পড়ে,
ঢেকে যায় মৃত্যুর অস্পষ্ট আগ্নেয়গিরিতে,
এমনই বিশ্রী যে ভাবা যায় না।

অথচ এই অন্ধ পাগুলো
কখনও থামে না কোথাও,
ঘণ্টার পর ঘণ্টা একটানা বিরামবিহীন হেঁটে যায়,
প্রথমে একটা পা, তরপর আর একটা,
কখনও মেয়ের
কখনও পুরুষের
কখনও ওপর থেকে আরও ওপরে,
কখনও নিচে থেকে আরও নিচে,
প্রান্তর মাঠ খনি আর বাজারের মধ্যে দিয়ে
সামনে কাছে
পেছনে দূরে
জুতো-পরা পাগুলো হেঁটে যায়,
ঘুমোবার কিংবা ভালোবাসার সময়টুকুতেও পর্যন্ত
খোলার অবকাশ পায় না,
কেবল অবিরাম হেঁটে যায়

যতক্ষণ পর্যন্ত না গোটা মানুষটা নিজে থেকে থমকে দাঁড়ায়।

তারপর নিজের অজান্তেই একদিন
মাটির গহনে নেমে যায়,
কেননা সেখানে তখন সব সবকিছুই অন্ধকার।
কোনোদিনই জানতে পারে না
ইচ্ছে করলে পাগুলো সত্যিই উড়তে পারতো
কিংবা হতে পারতো টুকটুকে পাকা আপেল।

যেখানে আমরা বাস করি

গোধূলিবেলায় সমুদ্রের মাঝ বরাবর
ছোট ছোট ওই পাথরের ঢিবিগুলোর ওপারে যারা বাস করে,
আমি তাদেরই একজন।

আমি যখন আসি
ব্যাপারটা কি ঘটছে চারদিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখি।

টান টান করে দিনটা নিজেকে মেলে দিয়েছে,
তার চতুর্দিকে আলো,
আর ক্রুদ্ধ সিংহের মতো
সহস্র থাবায় সমুদ্র তার বুক চাপড়াচ্ছে।

উন্মুক্ত দিগন্ত, যাকিছু নির্জনতা যেন গান গাইছে
আর আনত শ্রদ্ধায় দারুণ ভয় পেয়ে
আমি যেন হারিয়ে গেছি,
সেই মৌন নিস্তব্ধতার দিকে তাকিয়ে বলছি :
'দুর্লভ নির্জনতা,

স্নেহময় মা আমার,
বিপুল আনন্দে আমি এখুনি গান গেয়ে উঠবো,
আমার বিশেষ কোনো কবিতা।'

তারপর থেকে আর একটা ঢেউও
আমাকে কখনও ফেলে দেয়নি,
আমি বরাবরই আকাশের স্নিগ্ধ সৌরভ টের পেয়েছি
জল আর মাটিতে,
অরণ্য আর সমুদ্র—দুজনেই একসঙ্গে পুড়েছে
নির্জন শীতের গভীরে।

মাটির কাছে আমি ঋণী
কেননা আমার জন্যে ও দীর্ঘদিন অপেক্ষা করেছে
সমুদ্র আর আকাশ যখন দুটি ঠোঁটের মতো
পরস্পরে এক হয়ে মিশে গেছে একটি রেখায়।
এক নির্জনতা থেকে আর এক নির্জনতায় বাস করা,
অনেক কিছুকে অনুভব করতে করতে পরিপূর্ণতায় পৌঁছে যাওয়া,
ব্যাপারটা কিন্তু আদৌ তুচ্ছ নয়, তাই না?

এখানের যাকিছু সবই আমি ভালোবাসি,
সর্ব রকম আগুনের মধ্যে
কেবল ভালোবাসাই একমাত্র যা অবিলোপী;
আর সেই জন্যেই আমি প্রাণ থেকে প্রাণে যাই
গিটার থেকে গিটারে,
আমার কোনো ভয় নেই
না আলোর না ছায়ার,
পৃথিবীটা তো প্রায় আমারই মতন,
অনন্তের সঙ্গে অবিরাম প্রেম করে যাই।

আর সেই জন্যে আমার দরজা-জানলা,

নম্বরবিহীন বাড়িটা খুঁজে পেতে কারুর কোনো অসুবিধেই হয় না
অন্ধকার কালো কালো পাথরের মাঝে
ভয়ংকর লবণ-উচ্ছ্বাসের ঠিক কাছটাতেই
আমরা বাস করি—
আমি আর আমার প্রিয়তমা,
ওখানেই আমরা শেকড় গেড়েছি।
এবার আমাদের সাহায্য করো
সাহায্য করো যাতে দিন দিন মাটির আপন হয়ে উঠতে পারি।
সাহায্য করো
যাতে ফেনা আর ওই ঢেউগুলোর মতো
পবিত্র হয়ে উঠতে পারি।

রাখালিয়া

আমি পাহাড়, নদী আর মেঘদের নকল করি।
পকেট থেকে কলমটা বার করে নিই। লিখে রাখি
উড়ন্ত একটা পাখি
কিংবা রেশমী জালে সেই ছোট্ট মাকড়শাটার খবর।
আমার মনের দরজা দিয়ে কিছুই পেরিয়ে যায় না।
আমি স্বচ্ছ বাতাসে
যেখানে তিরতির করে কাঁপে পাকা গমের শিষ,
যেখানে উড়ন্ত পাখির ডানা বিপুল আনন্দে আমাকে ভরিয়ে তোলে,
যেখানে হঠাৎ করেই খসে পড়ে একটা পাতা,
হ্রদের জলে নিশ্চল হয়ে থাকে মাছের গোল গোল চোখদুটো,
স্বচ্ছ মেঘমালায় ভেসে চলে নানান প্রতিমূর্তি,
বৃষ্টির যত দুর্বোধ্য জটিল আঁকিবুকি

কিছুই পেরিয়ে যায় না আমার মনের দরজা দিয়ে

কেবল গ্রীষ্মের নিপুণ স্বচ্ছতা। আমি বাতাসের গান গাই,
যত শবাচ্ছাদন আর পদক কুড়তে কুড়তে
ইতিহাস ছুটে চলে তার স্বর্ণরথে,
আর আমি কেবল আমার সত্তায় অনুভব করি যত কল্লোলিত নদী ;
বসন্তের সাথে আমি কেবল নিঃসঙ্গ একাই পড়ে থাকি।

রাখাল, হে রাখাল, তুমি কি জানো না
ওরা সবাই তোমার জন্যে অপেক্ষা করছে ?

আমি জানি, অথচ ঝরনার এপারে
পঙ্গপালেদের দীপ্ত উল্লাসে কান পাতা দায়,
যদিও ওরাও অপেক্ষা করছে, আমি অপেক্ষা করতে চাই
আমার নিজের জন্যে। আমি লক্ষ্য করতে চাই নিজেকে।
শেষ পর্যন্ত আমি আবিষ্কার করতে চাই আমার নিজের অনুভূতি ;
আর যেখানে অপেক্ষা করছি সেখানে যখন এসে পেঁছই
আমার ভীষণ ইচ্ছে করে ঘুমিয়ে পড়তে,
ইচ্ছে করে হাসতে হাসতে মরে যেতে।

দক্ষিণে অশ্বারোহণ

ম্যালেকো পর্বতমালা
ঘোড়ার পিঠে প্রায় একশো কুড়ি মাইল পথ,
সদ্য ফসলকাটা মাঠ
তীক্ষ্ম সবুজ বাতাস।
গমের ক্ষেত আর পাহাড়ি প্রান্তর,
চকিতে একটা পাখি ডেকে উঠলো,
কেঁপে গেলো জলের রেখা—
পৃথিবী হারালো তার অনাবিল স্বচ্ছতা।

বৃষ্টি

ফোঁটায় ফোঁটায় বৃষ্টি
তীক্ষ্ণ ছুঁচের মতো অবিরাম বৃষ্টির ফোঁটা,
লাফিয়ে-চলা ঘোড়াটা যেন
বৃষ্টির মধ্যে গলে গেলো,
আর সেই ভয়ংকর বৃষ্টির ঘোড়ায় চড়ে
ছুটে চললাম বাতাসের মধ্যে দিয়ে।

বৃষ্টির ঘোড়ায় চড়ে আমি পেরিয়ে গেলাম এই অঞ্চল,
পেছনে পড়ে রইলো
ম্যালেকো পর্বতমালার
বিস্তীর্ণ সজল নির্জনতা।

আমার বাজে শিক্ষা প্রসঙ্গে

কোনটে কি, কোন জিনিসটা কেমন ?
কেমন করে যে নিজের ভালোমন্দ দেখতে হয় কে জানে ?

মাছেদের কি সহজ সরল জীবন !
চলতে ফিরতে কখনও সার ভাঙে না।
সমুদ্রে ওরা যেন সব কেতাদুরস্ত অভ্যাগত,
সবসময়েই নিখুঁত পোশাকে,
অর্থাৎ আঁশে সর্বাঙ্গ ঢাকা থাকে,
একটা আঁশও জলে স্থানচ্যুত হয় না।

অথচ আমি—প্রতিদিন প্রাতরাশের টেবিলে
পা তুলে দিই, প্লেটে শুধু যে কনুইই রাখি তাই নয়,
আমার মূত্রাশয়, আমার বীণা, আমার আত্মা

আর দোনলা বন্দুকটাও রাখি।

আমার হাতদুটোকে নিয়ে যে কি করবো ভেবেই পাই না,
যেন ও দুটোকে কোনোদিন সঙ্গে নিয়েই আসিনি,
কিন্তু এখন কোথায় আংটি পরবো ?
আঃ, কি ভঙ্গুর এই অনিশ্চয়তা !

এবং শেষ পর্যন্ত আমি কাউকেই চিনতে পারি না।
মনে পড়ে না একটা নামও।

—মশাইকে যেন চিনি চিনি মনে হচ্ছে ?
—আরে, তুমি তো সেই চোরাচালানী না ?
—আরে মা-ঠাকরুন, আপনি সেই
পাঁড় মাতাল কবিটার প্রণয়িনী নন,
যে কেবল ছাদের ওপর দিয়ে
হাঁটতো হাঁটতো আর হাঁটতো ?
—তার পাখা ছিলো বলে সে আকাশে উড়তেও পারতো।
—আর মাটির ঘাসে তুমি কেবল নামতে নামতে আর নামতে।
—আমি ছুঁড়িটাকে হিন্দু-বিধবার মতো
জ্বলন্ত চিতায় তুলে দিতে চাই।
কেন, তাকে জ্বলন্ত চিতায় তুলে দেওয়া যায় না বুঝি ?
সত্যি, সে এক দম-বন্ধ-করা দৃশ্য !

আর একবার বিদেশী এক দূতাবাসে
কৃষ্ণকলি একটা মেয়ের প্রেমে পড়ে গেলুম।
ও সেখানে কিছুতেই বিবস্ত্র হবে না
আমিও ছাড়বো না—
বললুম, পাগল হয়েছো, তুমি তো পাথরের প্রতিমূর্তি,
এত কাপড়চোপড় পরে হাঁটবে কেমন করে ?

সেদিন থেকে তো বটেই, অন্য কোনো উৎসবেও
আমার যাওয়া ছিলো বারণ,
ভুলেও আমার পায়ের শব্দ পেলে
ওরা দরজা-জানলা সব বন্ধ করে দিতো।

তখন আমি গেলুম জিপসি, জাদুকর
বেকার মাঝিমাল্লা আর যাদের জালে কখনও মাছ পড়েনি
সেই সব জেলেদের কাছে, ঘুরলুম কিছুদিন,
কিন্তু ওদেরও নিজস্ব একটা রীতিনীতি আছে,
আমার বাজে শিক্ষা সেখানে কোনো কাজেই লাগলো না।

অতএব যাওয়া-আসা প্রায় বন্ধই করে দিয়েছি,
পোশাক-আশাক যেমন পরি না
তেমনি উলঙ্গ হয়েও রাস্তায় হাঁটি না।
কাঁটা চামচে ছুরি সব জলাঞ্জলি দিয়েছি ইঁদারায়।
নিজের দিকে তাকিয়ে কেবল হাসি,
কখনও বোকার মত প্রশ্ন করি না।
আর খ্যাতির মোহে কেউ যদি কখনও
নেমন্তন্ন করেই বসে
আমি পাঠিয়ে দিই আমার জামাকাপড়, জুতো,
কামিজ আর টুপি—
কিন্তু তাতেও ওরা খুশি নয়,
আমার সুটটায় নাকি টাই বাঁধা ছিলো না।

তাই, যতরকম সন্দেহ থেকে মুক্তি পাবার জন্যে
আমি সহজ সরল জীবন বেছে নিয়েছি,
যতটা সম্ভব হাড়ভাঙা খাটুনির পর পরম আলস্য।
হোটেলে একাই খানা খেতে যাই,
একাই আবার নিঃশব্দে ফিরে আসি।
কখনও কখনও ইচ্ছে করে একা একাই নাচি,

কিন্তু তেমন উৎসাহ পাই না,
ইচ্ছে না থাকলেও একা একাই বিছানায় শুতে যাই।

যেহেতু এখানে পৌঁছে গেছি, বিদায়।

বড্ড তাড়া আছে, এখুনি আমাকে যেতে হবে, সুপ্রভাত।

কেউ যখন আমার সঙ্গে দেখা করতে আসে, এখন তারা
জেনে নিয়েছে যেখানে আমি নেই সেখানেই আমাকে খুঁজতে হবে,
আর সত্যিই তাদের যদি কিছু বলার বা সময় হাতে থাকে
তাহলে দেওয়ালে টাঙানো আমার ছবিটার সঙ্গে কথা বলতে পারে।

ফলশ্রুতি

লোকটা সত্যিই খুব ভালো ছিলো,
তার লাঙল আর কোদালের মতো সে ছিলো অবিসংবাদী
এমন কি ঘুমিয়ে ঘুমিয়েও তার
স্বপ্ন দেখার সময় ছিলো না।

সে ছিলো একফোঁটা ঘামেরই মতো গরীব।
সে ছিলো একটা ঘোড়ার সমান মূল্যবান।

আজ তার ছেলে খুব মানী একজন,
ওর মূল্য আজ কয়েকটা দামী গাড়ির সমান।

ছেলেটা মন্ত্রীর গলায় কথা বলে,
বড় বড় পা ফেলে হাঁটে,
তার গরীব কৃষাণ বাবার কথা ও ভুলেই গেছে।

পেটমোটা খবরের কাগজের মতো করে ও ভাবে,
দিন রাত কেবল পয়সার ধান্দা করে
এমন কি ঘুমিয়ে ঘুমিয়েও।

ছেলের ছেলেরা অনেক,
কিছুদিন আগেই তাদের বিয়ে হয়ে গেছে।
তারা কিছুই করে না, কেবল বসে বসে খায়।
তাদের মূল্য অসংখ্য ইঁদুরের সমান।

ছেলের ছেলের ছেলেরা—
পৃথিবীর হালটাকে ওরা কি বানিয়ে ছাড়বে কে জানে!
ওরা ভালো হবে না খারাপ হবে?
ওদের মূল্য মাছি না গমের সমান?

আমি জানি এর জবাব দিতে তুমি চাও না।

কিন্তু প্রশ্নগুলো থেকেই যায়, মরে না।

শরতে বিস্মৃতি

শরৎকাল
তখন সাড়ে সাতটা
আমি একজন কিংবা কারুর জন্যে
অপেক্ষা করছি।
সময়ও
আমার সঙ্গে অপেক্ষা করে করে ক্লান্ত,
গুটিগুটি পায়ে সেও আমাকে
একলা ফেলে রেখে কেটে পড়লো।

খুন-হয়ে-যাওয়া অসুখী একটা সন্তার
অজস্র ভাঙাচোরার মাঝে,
জল আর দিনের শুকনো বালির সঙ্গে
আমি নিঃসঙ্গ পড়ে রইলুম।

প্যারির পাতারা আমাকে শুধলো,
'কি ব্যাপার, কার জন্যে অপেক্ষা করছো ?'

ইতিমধ্যে বেশ কয়েকবারই আমার কপালে হেনস্তা জুটেছে-
প্রথমে দিনের আলো তার যাবার সময়,
তারপর কুকুর বেড়াল আর যত-রাজ্যের প্রহরী।

সম্পূর্ণ একা আমাকে পড়ে থাকতে হলো
নিঃসঙ্গ একটা ঘোড়ার মতন,
শীতের লবণ ছাড়া
দিনে বা রাতে ঘাসের সঙ্গে যার কোনো সম্পর্ক নেই।

আমি দাঁড়িয়ে রইলুম
খাঁ খাঁ করা এমনই নিঃসঙ্গ একা যে
পাতাগুলো পর্যন্ত কাঁদতে লাগলো,
যারা ছিলো শেষ সম্বল
তারাও অশ্রুর মতো টুপটাপ টুপটাপ ঝরে গেলো।

এর আগে
বা পরে
এমন নিঃসঙ্গতা এর আগে আর কখনও অনুভব করিনি।
কারুর জন্যে অপেক্ষা করছি ঠিকই—
কিন্তু কার জন্যে এখন আর মনে নেই,
সত্যি,
ব্যাপারটা এমনই অদ্ভুত

যেন এই মুহূর্তে
যে কথাটা মনে পড়লো
পথে আসতে আসতে হঠাৎ
কোথায় যেন তা ডানা মেলে উড়ে পালিয়েছে।

পরে আমি অবশ্য সেই কদাকার জায়গাটা থেকে
পালিয়ে গেছি,
যতটা সম্ভব জোরে দৌড়েছি,
যেন রাতের অন্ধকার থেকে
একটা কালো পাথর আমার পেছন পেছন ধেয়ে আসছে।
এতক্ষণ যা বললুম হয়তো তা কিছুই সত্যি নয়,
কিন্তু একজন কিংবা কারুর জন্যে যখন অপেক্ষা করছি।
আমার জীবনে সত্যিই তেমনটা একবার ঘটেছিলো।

একজন, যে সুখী নয়

দরজার সামনে ওকে প্রতীক্ষায় রেখে
আমি চলে গিয়েছিলাম অনেক অনেক দূরে।

ও জানতো না আমি আর কোনোদিনই ফিরে আসবো না।

কুকুরটা পার হয়ে গেলো, পার হয়ে গেলো একজন সন্ন্যাসিনীও,
কেটে গেলো একটা সপ্তাহ, একটা বছর।

বৃষ্টির ধারা আমার পায়ের চিহ্ন মুছে দিয়েছে
ঘাস গজিয়েছে পথের বুকে,
একের পর এক, অনড় পাথরের মতো
বছরগুলো চেপে বসেছে ওর বুকের ওপর।

তারপর ঝলকে ঝলকে রক্তের বন্যায় এলো যুদ্ধ।
শিশু বুড়ো ঘরবাড়ি সব ভেঙে তছনছ হয়ে গেলো।

সেই মেয়েটা কিন্তু তখনও বেঁচে।

সারাটা তল্লাট জুড়ে জ্বলে উঠলো আগুন।
অযুত বছর ধরে ধ্যানমগ্ন ঈশ্বরের
শান্ত প্রতিমূর্তিগুলো ছিন্নভিন্ন,
মন্দিরগর্ভ থেকে বিচ্যুত।
ওদের আর স্বপ্ন দেখারও কোনো অবকাশ নেই।

ছোট ছোট সুন্দর বাড়িগুলো, যার বারান্দার
দোলনায় শুয়ে আমি ঘুমোতাম,
রঙিন গাছপালা আর বিশাল হাতের
মুঠোর মতো স্বচ্ছল পাতা,
চিমনি আর মাঠগুদোম
সব জ্বলে পুড়ে ছারখার হয়ে গেছে।

একদিন যেখানে শহরটা দাঁড়িয়ে ছিলো
আজ সেখানে শুধু তার কঙ্কালটাই পড়ে রয়েছে,
দোমড়ানো-মোচড়ানো লোহালক্কড়,
মৃত প্রতিমূর্তির হাসিহাসি মুখ
আর কালো কালো রক্তের দাগ।

এবং সেই মেয়েটা আজও আমার জন্যে অপেক্ষা করছে

ভালোবাসা

কতদিন, আহা, কতদিন ধরে
তোমাকে এত কাছের, এত আপন বলে দেখে এসেছি
কি দিয়ে কেমন করে তার প্রতিদান দেবো ?

রক্তের তৃষ্ণা নিয়ে
বনে বনে জেগে উঠেছে বসন্ত।
শেয়ালগুলো তাদের গর্ত থেকে বেরিয়ে পড়েছে,
সাপেরা পান করছে শিশির,
আর আমি তোমাকে নিয়ে বেরিয়ে পড়েছি
মৌন নিস্তব্ধতা আর ঝাউবীথির মাঝে
পাতার অরণ্যে,
নিজেকেই শুধাই—কখন কেমন করে
আমার এই সৌভাগ্যের প্রতিদান দেবো।

আজ পর্যন্ত যা কিছু যত কিছু দেখেছি
তার মধ্যে তুমিই যাকে আমি অনুক্ষণ দেখতে চাই,
আজ পর্যন্ত যা কিছু স্পর্শ করেছি
কেবল তোমার শরীর
যাকে আমি সারা জীবন স্পর্শ করে থাকতে চাই।
আমি ভালোবাসি তোমার কমলারঙের হাসি।
তোমাকে ঘুমতে দেখলে আমি সত্যিই বিচলিত হয়ে উঠি

কি করবো বলো, ভালোবাসা, প্রিয়তমা আমার ?
আমি জানি না অন্যেরা কেমন করে ভালোবাসে
কিংবা ভালোবাসতো অতীতকালে।
আমি বেঁচে আছি, তোমাকে দেখছি, ভালোবাসছি।
ভালোবাসার মধ্যে ডুবে থাকাটাই যে আমার স্বভাব।

প্রতিদিন সন্ধ্যেবেলায় তুমি আমাকে আরও আরও খুশি করো।
তোমার চোখদুটো আমার দৃষ্টির সীমানা থেকে
উধাও হয়ে গেলেই আমি সবাইকে জিগেস করতে থাকি—
ও কোথায়? এতক্ষণ কি করছে!
আমি ভাবতে বসি, ব্যথা পাই,
নিজেকে কি ভীষণ দুঃখী আর বোকা বোকা লাগে,
চকিতে তুমি বিদ্যুৎ-ঝলকের মতো
পীচ গাছের নিকুঞ্জ থেকে হাসতে হাসতে বেরিয়ে আসো।

ঠিক এই কারণেই তোমাকে আমি ভালোবাসি
আর বাসবো নাই বা কেন?
কারণ তো কত রয়েছে, আবার নেই বললেও চলে,
কেননা ভালোবাসাকে ঠিক এমনটাই তো হতে হবে
মগ্ন অথচ স্বাভাবিক,
বিশেষ অথচ ভয়ংকর,
সম্ভ্রম অথচ শোকাবহ,
নক্ষত্রের মতো পুষ্পিত,
আর চুম্বনের মতো সীমাহীন।

গাথা

রানকাগুয়ার কাছে শরতের এক সকালে
গিটারটা আমায় পিছুডাক দিলো—ফিরে এসো।
বিবর্ণ হয়ে গেছে পপলারের পাতাগুলো,
ভেসে আসছে মৃদু ঘণ্টাধ্বনি।
অসম্ভব শীত আর সারাটা আকাশ যেন
বিষাদের ওপর টান টান করে নিজেকে মেলে দিয়েছে

আপাদমস্তক আঙুরের বোঝা মাথায় নিয়ে

একজন মাতাল হোঁচট খেতে খেতে
সারাবখানায় প্রবেশ করলো,
টুপির কাণা থেকে ওর জ্বলজ্বলে চোখদুটো কেবল দেখা যাচ্ছে।
বুট ভর্তি কাদা,
শরতের অনন্যা প্রতিমূর্তি,
চাঁপাকলির মতো সুন্দর তার আঙুলগুলোকে
ও দু'পায়ে দলে থেঁতলে এসেছে।

প্রেইরির দিকে আমার আর কখনও ফেরা হয়নি,
অথচ পল অনুপল কত যে ঘণ্টা বৃথাই কেটে গেছে।
বহুদিন পর হঠাৎ আজ যখন ভাবি
কত বিস্মৃতিই না বুকের মধ্যে স্পষ্ট ভেসে ওঠে—
গিটারটা কি এখনও আমায় ডাকে ?
কত যুগ কেটে গেছে
যেন এখন আর কোনোকিছুরই অস্তিত্ব নেই,
না রানকাগুয়ার সেই বিস্তীর্ণ তৃণপ্রান্তর না সেই শরতের।
তবু একদিন হঠাৎ করেই প্রেতাত্মার মতো
আপাদমস্তক আঙুরের বোঝা কাঁধে নিয়ে
আমি ফিরে যাবো সেই অপার শূন্যতায়,
পিছু-ডাকা গিটারটার কথা জিগেস করবো ;
যেহেতু সেখানে কেউ থাকবে না
আমার কথা কেউ কিছুই বুঝতে পারবে না,
ফলে যার কোনো চিহ্ন নেই সেই দরজাটা
বন্ধ করে দিয়ে আবার আমাকে ফিরে আসতে হবে।

বেড়ালের স্বপ্ন

কি পরিচ্ছন্ন পরিপাটি ভাবেই না বেড়ালটা ঘুমোচ্ছে,
ঘুমোচ্ছে তার হিংস্র নখ আর থাবা গুটিয়ে,

ঘুমোচ্ছে উদাসীন রক্তের চিহ্ন নিয়ে
অনায়াস শরীরের বৃত্তে কুণ্ডলী পাকিয়ে,
আর তার বালি-রঙের লোমশ লেজটা পড়ে রয়েছে
যেন কারুকার্য-করা ধূসর ভূচিত্রাবলী।

সময়ের নরম কোমল লোম
চকমকি পাথরের মতো খসখসে জিভ
আর আগুনের শুষ্ক যৌবনতা নিয়ে,
আমারও উচিত বেড়ালটার মতো পরিচ্ছন্ন ঘুমনো ;
আমার উচিত কাউকে কিছু না জানিয়ে
ব্যগ্র তন্ময়তায়
ইঁদুর ধরার স্বপ্ন নিয়ে
নিজেকে এ পৃথিবীর ওপর ছড়িয়ে দেওয়া,
ছড়িয়ে দেওয়া যত ছাদ আর প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলীর ওপর।

আমি নিজে দেখেছি ঘুমের মধ্যেও বেড়ালের দেহটা
কি আশ্চর্য তরঙ্গায়িত হয়ে ওঠে, কিভাবে
অন্ধকার জলের মতো রাত্রি তার শরীরে প্রবেশ করে।
কখনও কখনও অবশ্য এর ব্যতিক্রম ঘটে
কিংবা নির্জন তুষারঝড়ে সম্পূর্ণ ডুবে যায়,
কখনও আবার ঘুমের মধ্যেই
কেঁদো বাঘের মতো সে এত ফুলে ওঠে
যে ছাদ মেঘ আর আগ্নেয়গিরির ওপর দিয়েই
বুঝি সে লাফ দেবে অতল অন্ধকারে।

পাথরে খোদাই করা গোঁফ
আর তোমার বিপুল রাজকীয় গাম্ভীর্য নিয়ে
ঘুমোও, ঘুমোও রাতের বেড়াল আমার,
যত্ন নাও আমাদের যত স্বপ্নে
তোমার নিষ্ঠুর হৃদয়

তোমার গর্বিত লেজের ঝাপটে
দূর করো আমাদের তন্দ্রাচ্ছন্ন দাম্ভিকতা যাকিছু বাধা।

বিদায় প্যারি, বিদায়

সেইন, উত্তুঙ্গ মিনার
গম্বুজ আর গাছপালা ঘেরা
নির্জন নদীটা কি আশ্চর্য সুন্দর !

আর আমি এখানে কি করতে যে এলুম ?

এখানের সবকিছুই গোলাপের চেয়ে
এলিয়ে-পড়া ক্লান্ত বিধ্বস্ত গোলাপের চেয়ে
আশ্চর্য সুন্দর।
রূপকথার মতো মায়াময়।
গোধূলিবেলা আর নিশান্তিকা যেন দুটো সাম্পান
নিঃশব্দে কেবল ভেসে যায়,
হাজার হাজার বছর ধরে পরস্পরকে চেনা
ভালোবাসে অথচ উদাসী।

পাথর কুঁচকে ছোট হয়ে যায়
গির্জার চূড়াগুলো দেখতে দেখতে আকাশে ওঠে,
আর শরত
ছেঁড়া মেঘ আর পুঞ্জ পুঞ্জ ধোঁয়ায়
আকাশকে ঢেকে দেয়,
আবছা জলের প্রান্তে কৃষ্ণাঙ্গ সম্রাটের মতো বসে থাকে।

পৃথিবীতে এমন মধুর সায়াহ্ন আর কোথাও নেই।

ধূসর যত রঙ, অস্পষ্ট কান্না
যেন চকিতে থমকে যায়,
শুধু থাকে কুয়াশা আর সবুজ পোশাক পরা
গাছেদের গায়ে জড়ানো আলোর রেখা।

চিলিতে আমার কত কাজ পড়ে রয়েছে।
মেলিনাস আর লারা আমার জন্যে অপেক্ষা করছে,
আমার দেশের সবার কাছেই আমি কিছু না কিছু ঋণী,
ঠিক এই মুহূর্তে সবার ঘরে ঘরে
আমার জন্যে খাবার টেবিল সাজানো হয়েছে।
তাছাড়া ওখানকার ধাতুর মতো পত্রবহুল গাছগুলোও
আমার দুঃখ বেদনা
আমার আনন্দকে খুব ভালো করেই চেনে,
ওখানকার যত ডানা যেন আমার নিজের,
ভালোবাসি ওখানকার সমুদ্র,
পাথরের মতো ভারি
প্রাসাদের চাইতেও বিশাল
নীলাভ নক্ষত্রের মতোই নীল আর কঠিন।

আর আমি এখানে কি করতে যে এলুম ?

কেমন করেই বা এখানে এসে পৌঁছলুম ?

স্মৃতিসৌধের নামকরণ করার জন্যে
বালি আর মানুষকে একসঙ্গে মেশানোর জন্যে
বেদচা আর মাটিকে স্পর্শ করার জন্যে
যখন যেখানেই ওরা ডাকবে আমাকে সেখানে পৌঁছতে হবে,
কেননা জন্মভূমির জন্যে আমাদের অনেক অনেক কিছুই করণীয় আছে ;
আমাদের গড়ে তুলতে হবে একটা স্বাধীন দেশ

গান রুটি আর আনন্দের জন্যে,
যেখানে আমাদের সম্মান হবে
সম্রাজ্ঞীর হাতের নখের মতো আশ্চর্য সুন্দর আর মসৃণ,
আমাদের পবিত্র নিশান
স্ফটিকের স্বচ্ছ মিনার ছাড়িয়েও
বাতাসে উড়বে পতপত করে।

বিদায় প্যারি, বিদায়,
শরত, নীল জাহাজ, প্রণয়াসক্ত সমুদ্র, বিদায়,
উন্মুক্ত নদীমালা আর যত সেতু, বিদায়
সুগন্ধি রুটি, গাঢ় অথচ কোমল মদিরা, বিদায়
বিদায় বন্ধুরা যারা আমায় ভালোবেসেছিলো,
গান গাইতে গাইতে আমি সমুদ্র পাড়ি দিয়ে ফিরে যাই,
ফিরে যাই আমার মাটির শিকড়ে নিজেকে উজ্জীবিত করবো বলে।
ঠিকানা আমার অর্থহীন,
আমি বাস করি উত্তুঙ্গ সমুদ্র প্রান্তরে।
আমার শহরটাই এ তামাম পৃথিবী।
রাস্তা মানেই তো—আমি যাই,
সংখ্যা মানে—আমি আর ফিরবো না।

সমুদ্র-সৈকতে আগন্তুক

আমি ফিরে এসেছি, অথচ সমুদ্র
তখনও আমাকে পাঠিয়ে চলেছে তার অদ্ভুত সাদা ফেনা।
যে পথটা আমার চেনা সে পথটার কোনো হদিসই ও রাখে না।
সমুদ্র-সৈকতের বালি আমাকে চিনতেই পারলো না।

জানান না দিয়ে তোমার ফিরে আসার খবর
সমুদ্র কিছুই জানে না,

এমন কি তুমি যে চলে গিয়েছিলে, তার খবরও না,
নীলিম জলরাশি এমনই ব্যস্ত যে
তোমার এসে পৌঁছনোর খবর তার কাছে অজানাই রয়ে গেছে।
ঢেউগুলো ঠিক তেমনই সংগীতমুখর ;
যদিও সমুদ্রের অজস্র বাহু
তবু কোনো হাতই তোমার কাছে এসে পৌঁছলো না,
না তোমার চুম্বনের জন্যে কোনো মুখ।
অল্পক্ষণের মধ্যেই তুমি বুঝতে পারলে
কি ভীষণ তুচ্ছ একটা জিনিস তুমি।
অথচ আমরা জানি আমরা পরস্পরে বন্ধু
বন্ধুর মতোই দু'হাত বাড়িয়ে আমরা ছুটে আসি,
আর সমুদ্র, আমাদের কথা একবারও না ভেবে
সমানে নেচে চলছে।

কুয়াশা, উড়ন্ত লবণকণা, আর ভাঙাচোরা ছড়ানো সূর্য দেখার জন্যে
আমাকে এখনও অপেক্ষা করতে হবে,
কেননা সমুদ্র উজ্জীবিত হয়ে উঠবে, উজ্জীবিত করবে আমাকেও ;
জল তো শুধু জল নয়
অস্পষ্ট অবরোধ,
ঢেউয়েরা বাতাসে অদৃশ্য ঘোড়ার মতো
গড়িয়ে যায়।

হঠাৎ করেই সমুদ্র যদি কোনোদিন
আমার ঘুমের মধ্যে হানা দেয়
স্বপ্নে আমাকে সাঁতার শিখতে হবে।
আর যদি তাই হয়, সত্যিই ভারি সুন্দর হবে,
ভিজে পাথরে যখন আগামীকাল জেগে উঠবে,
বালি আর বিশাল সমুদ্রের
মর্মরিত শাসন জানবে আমি কে আর কেনই বা ফিরে এসেছি,
ওরা তখন আমাকে বুকের মধ্যে টেনে নেবে।

বালির সেই বিপুল নৈঃশব্দ্যে
আমি আবার শান্ত হতে পারবো,
বাতাসে বেড়ে উঠবো,
সম্মানিত হবো সমুদ্রের বিশাল সাম্রাজ্যে

শনিবারগুলো অন্তহীন

আহা, শনিবারগুলো কি অন্তহীন !

এতগুলো মানুষ নিয়ে এই যে সচল পৃথিবী,
সত্যিই ভারি চমৎকার ।
হোটেলে হোটেলে পায়ের চঞ্চল ঊর্মিমালা,
মোটরসাইকেল আরোহীদের ব্যস্ত আনাগোনা,
সব রেলপথগুলোই গেছে সমুদ্রের দিকে,
আর দোকানে কাজ করে যেসব মেয়েরা
তাদের অনেকেই আজকাল দ্বিচক্রযানে যাতায়াত করে ।

এক এক করে সপ্তাগুলো আসে আবার শেষ হয়ে যায় ।
স্ত্রী পুরুষ নির্বিশেষে সবাই হৈ-হল্লা করে
অযথা কিছুই বাদ দেয় না,
অসংলগ্ন পাহাড়ে ঠেলে ওঠে,
অর্থহীন গানের সুর গোগ্রাসে গেলে,
তারপর ক্লান্ত শ্রান্ত হয়ে যে যার আস্তানায় ফিরে আসে

প্রতি শনিবারগুলোয় আমি নেশায় বুঁদ হয়ে থাকি,
অথচ নিষ্ঠুর চার দেওয়ালের মাঝে বন্দী যেজন
তাকে কখনও ভুলতে পারি না ।
তার সপ্তার সাতটা দিনের কোনো নাম নেই,

যা কিছু গুঞ্জন বুধাই তার চারপাশে
সমুদ্রের মতো মর্মরিত হয়ে ওঠে,
ঢেউগুলো, আর্দ্র সজল শনিবারের ঢেউগুলোর যে কি অর্থ
সে কিছুই বুঝতে পারে না।

আঃ, শনিবারগুলো যে কি জঘন্য বিরক্তিকর,
পায়ের মধ্যে মুখ গুঁজে তালগোল পাকিয়ে যাওয়া,
অতীতকে ভুলে থাকার জন্যে
আকণ্ঠ নেশায় বুঁদ হওয়া—
তবু ইতরজন সম্পর্কে আমাদের কোনো অভিযোগই থাকতে পারে না
কেননা ওরা এড়িয়ে চলতে চায় আমাদের সঙ্গ।

গুইলারমিনা কোথায় থাকতে পারে ?

গুইলারমিনা কোথায় থাকতে পারে ?

আমার বোন যখন ওকে নেমন্তন্ন করেছিলো
আমি নিজে গিয়ে দরজাটা খুলে দিয়েছিলুম,
এক ঝলক রোদ্দুর, আকাশের নীলিম নক্ষত্র,
পাকা গমের সোনালী দুটো শিষের মতো
ও ধীরে ধীরে ঘরের ভেতরে প্রবেশ করলো,
ওর চোখদুটো এমনই আশ্চর্য যা কখনও ফুরবার নয়।

আমার বয়েস তখন চোদ্দ,
ছিপছিপে নরমা চেহারা, ভ্রূকুটিভরা তীক্ষ্ণ চোখ,
কিছুটা বিষণ্ন অথচ গর্বিত,
সভ্যভব্য অথচ কেমন যেন শোকাবহ।

মাকড়সাদের মধ্যে আমি বাস করেছি,
বনের নেশায় মাতাল যত পোকামাকড়
আর তিনরঙা মৌমাছিরা
আমাকে খুব ভালো করেই চেনে।
পুদিনা ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে থাকা
বন-তিতিরদের সঙ্গে আমি দীর্ঘদিন ঘুমিয়েছি।

আশ্চর্য উজ্জ্বল নীল দুটো চোখ মেলে
গুইলারমিনা ধীরে ধীরে ঘরের ভেতরে প্রবেশ করলো,
ওর সে আয়ত চোখের দৃষ্টি যেন আমাকে
শীতের দেওয়ালের গায়ে তরবারির মতো বিদ্ধ করে ফেললো।
ঘটনাটা ঘটেছিলো টেমুকো থেকে আরও দক্ষিণে
সীমান্তের কাছ বরাবর।

কচ্ছপের মতো গুটিগুটি পায়ে
খেপা ষাঁড়ের মতো গর্জন করতে করতে
বছরগুলো ধীরে ধীরে গড়িয়ে গেলো।
জোড়াতালি দেওয়া, রক্তাক্ত, শোকাবহ
বছরগুলো দেখতে দেখতে পার হয়ে গেলো.
আর আমি হেঁটে চললুম মেঘ থেকে মেঘে
দেশে থেকে দেশান্তরে, চোখ থেকে অন্য আর এক চোখে,
সীমান্ত জুড়ে তখন অবিরাম ধূসর বৃষ্টি পড়ে চলেছে।

একই জুতোজোড়া পায়ে গলিয়ে
আমার হৃদয় সমানে ছুটে বেড়িয়েছে,
হজম করেছে কাঁটার আঘাত।
যেখানে গেছি কোথাও বিশ্রাম পাইনি এতটুকু,
যেখানে মেরেছি মার খেয়েছিও বিস্তর,
যেখানে ওরা আমায় খুন করেছে
আমি মুখ থুবড়ে পড়েছি মাটিতে,

তারপর আগের চেয়ে
আরও তাজা হয়ে আবার বেঁচে উঠেছি—
তারপরের কাহিনী বলতে গেলে
অনেক অনেক অনেক অনেক সময় লাগবে।

এর পর আমার আর কিছু বলার নেই।

এ পৃথিবীতে আমি কেবল বাঁচতে এসেছি।

গুইলারমিনা কোথায় থাকতে পারে ?

অসংখ্য নাম

সোমবারগুলো মঙ্গলবারের জালের ফাঁদে জড়িয়ে যায়
আর সপ্তাহগুলো সারাটা বছরের ফাঁদে।
ক্ষয়ে যাওয়া জীর্ণ কাঁচি দিয়ে
সময়কে কখনও কাটা যায় না.
দিনের যাকিছু নাম
রাত্রির জলস্রোতে নিঃশব্দে মুছে যায়।

কেউ বলতে পারে না তার নাম পেড্রো,
রোজা কিংবা মারিয়া,
আমরা সবাই হয় ধুলো নয়তো বালি,
আমরা সবাই বৃষ্টির গায়ে বৃষ্টি।
ওরা আমাকে বুছুবার ভেনিজুয়েলা
চিলি আর প্যারাগুয়ের কথা বলেছে,
কিন্তু ওরা কি বলছে সে সম্পর্কে আমার কোনো ধারণাই নেই।
আমি চিনি কেবল এ পৃথিবীর বাইরের আবরণটাকে,

জানি তার কোনো নাম নেই।

যখন আমি শিকড়ের গহনে বাস করি
ওরা আমাকে ফুলের চাইতেও বেশি খুশি করে,
যখন আমি কোনো পাথরের সঙ্গে কথা বলি
উদাত্ত ঘণ্টাধ্বনির মতো সে বেজে ওঠে।

সময়টা এত দীর্ঘ যে বসন্ত
গড়িয়ে যায় সারাটা শীতকাল।
সময় হারিয়ে ফেলে তার জুতোজোড়া।
একটা বছর টিঁকে থাকে সুদীর্ঘ চারটে শতাব্দী ধরে।

আমাকে ডাকা হোক বা না হোক
প্রতিদিনই রাত্তিরে আমি ঘুমতে যাই.
যখন জেগে উঠি -আমি কে,
ঘুমতে যাবার আগে সত্যিই ছিলুম কি না, কিছুই মনে পড়ে না।

তার মানে নতুন জন্ম নিয়ে ফিরে আসার চাইতে
সত্যিই আমরা কোনোদিন জীবনে পদার্পণ করেছিলুম কিনা
সেটাই সবার আগে ভেবে দেখতে হবে;
দেখতে হবে আমাদের মুখগুলোকে
যেন অসংখ্য দ্বিধাকম্পিত ভাঙা ভাঙা নামে না ভরিয়ে তুলি,
যেন অসংখ্য বিষণ্ণ লৌকিকতায় না ভরিয়ে তুলি,
যেন অজস্র আড়ম্বরপূর্ণ চিঠিতে না ভরিয়ে তুলি,
যেন অজস্র তোমার আর আমার-তে না ভরিয়ে তুলি,
যেন অগণন কাগজের স্বাক্ষরে না ভরিয়ে তুলি।

আমারই মনটাই এমন যার স্বভাব হলো সবকিছুকে গুলিয়ে ফেলা,
ছিঁড়ে ফেলে আবার নতুন করে গড়ে তোলা,

আমি চাই সবকিছুতে মিশিয়ে ফেলতে, নগ্ন করতে
যতক্ষণ না এ পৃথিবীর সমস্ত আলো
সমুদ্রের একক
বিশাল উদার একটা সত্তার স্নিগ্ধ সৌরভে মিশে
একাকার হয়ে যায়।

এ যেন ভরা জোয়ার

এ যেন ভরা জোয়াব, বিলাপের রঙে অপলক
ও যখন তাকিয়ে থাকে আমার দিকে।
যখনই অনুভব করি ঝিনুকের মতো শুভ্র ওব দেহের সঞ্চালন
শিরা-উপশিরায ধমনীব রক্তস্রোত ছড়ায় উন্মত্ততা,
এ যেন ভরা জোয়ার ও যখন থাকে আমাব পাশে।

দীর্ঘ প্রসারিত চোখে আমি দক্ষিণের সমুদ্রে তাকিয়ে দেখি
ঢেউয়ে ঢেউয়ে অতল জলরাশি,
রাত্রিদিন অমোঘ নিযমে ওঠে ভাঙে
ছড়ায় বিস্তীর্ণতা।
প্রাচীন পদচিহ্নে
সংকীর্ণ পাহাড়ি পথে ফেনিল জলেব দাগ,
বিশাল গোলাপেব মতো প্রস্ফুটিত
প্রতিটি নক্ষত্র থেকে আসা ঊর্মিল জলরাশি।
অন্তর্বাসেব নিচে দুঃসাহসী হাতের মতো ঢেউ
ধেয়ে যায় সমুদ্রসৈকতে।
পাথরের খাঁজে খাঁজে
ঘাতকের মতো নিঃশব্দে চুঁইয়ে নামে জল।
উন্মুক্ত শিরার মতো অশুভ রাত্রির জল

বিনিদ্র বন্দরের নিচে
কিংবা সমুদ্রের আপন হৃদয়ের মতো
আশ্চর্য এক উজ্জ্বল দীপ্তিতে।
সে আমার সত্তায় বহন করে নিয়ে আসে এমন কিছু
যা আমাকে গড়ে তোলে ভীষণ
ও যখন থাকে আমার পাশে।

এ যেন ভরা জোয়ার ভাঙে ওর চোখের পাতায়
সোহাগে জড়ায় ওর মুখ ওর স্তন ওর বাহু।
যন্ত্রণার কোমল ভালবাসা, অসহ্য যন্ত্রণা
অসহ্য কামনার ঘণ্টাধ্বনি
যা রাত্রে আমার আর ওর মগ্ন চেতনায় আরও স্বচ্ছ হয়ে বাজে
যেন আকাশে উৎক্ষিপ্ত তীরের তীক্ষ্ণ গতি!

ওর সত্তায় পাখাবিহীন কি যেন বিশাল পাখা মেলে ওড়ে
কি যেন আমার প্রতিটা শব্দে গভীর গহ্বর খুঁড়ে চলে
কি যেন সব কিছুকে উপেক্ষা করে,
অন্ধ গুহায় বন্দীর মতো চারদিকে বিস্তীর্ণ ছড়িয়ে পড়ে।

রাত্রির বুকে
আমার স্বপ্নিল চোখের নির্জনতায় গড়ে ওঠা ওর দেহরেখা
আমার হাতের ছেনিতে অরণ্যের প্রতিটি বৃক্ষে ও খোদিত :
ও, ওর আনন্দ আমি নিজে।
ও, ওর কালো চোখের পল্লব।
ও, ওর আরক্ত হৃদয়ের লাল প্রজাপতি
যে তার নরম কোমল দুটি পাখায় আমাকে স্পর্শ করে,
যে চায় না আমার জীবনের সংকীর্ণ উপত্যকা!
এ যেন সম্পূর্ণ স্বাধীন বাতাস।
যদি আমার শব্দ কখনও ওকে কাঁটার মতো বেঁধে
টুপটাপ বৃষ্টির মতো ঝরে পড়বে চোখের জল।

এ যেন ভরা জোয়ার যা আমাকে নিঃশব্দে টেনে আনে,
এ যেন ভরা জোয়ার ও যখন থাকে আমার পাশে।

সাঁজাই

তুমি আমার শরীরী ত্বকের চেয়ে আরও গভীরে।
যখন ভেতরে খুঁজি, ধমনীতে, রক্তের প্রবাহে,
রহস্যময় আমার আলোক-সঞ্চারী প্রতিটা শিরা-উপশিরায়
তোমাকেই দেখি, তুমি যেন শোণিতধারা
যেন কোনো উন্মাদ আনন্দ।
আমি কেবল বাইরেই ঘুরি, সুদীর্ঘ কাল—প্রলাপে, পরিচ্ছদে!
আমি যেন গাঢ় অন্ধকার কোনো এক আদিম অরণ্য
যার গহনে অন্ধের মতো কেবলই পথ হাতড়ে বেড়াই
কোথাও কোনো নিশানা নেই, না কোনো অবলম্বন,
অথচ আমারই সত্তায় পুষ্পিত তোমার আরক্ত গোলাপ।
আমারই গভীরে তুমি ক্রমশ ফুটে ওঠো,
অগম তার উৎসধারা,
তোমারই ওই আয়ত চোখদুটো আমি যেন কিছুতেই স্পর্শ করতে পারি না।
ভয় হয় আঙুলের একটু ছোঁয়ায় বুঝি তার সব দল ঝরে যাবে,
আমার আকণ্ঠ তৃষ্ণায় জ্বলে যায় তোমার শরীরের তীব্র শিখা,
কেবলই দূরে দূরে সরে যায় তোমার মুখের পত্রালী।
'কে, কে ওখানে?' সহসা চিৎকার করে উঠি,
যেন মাঝরাতে কেউ এসে দরজায় টোকা দেয়,
তারপর চারদিক জুড়ে নিটোল নিস্তব্ধতা,
হাওয়া ছাড়া আর কিছু নেই,
শুধু গাছ, জল আর দিনান্তের নিভন্ত আগুন,
যেন এ ছাড়া আর কোনোদিনই কিছু ছিলো না ওখানে।
অথচ যখনই দু'চোখ বন্ধ করি, নামহীন জীবনে

আমার পঙ্কিল বুকে ভেসে-ওঠা উদ্ভিদের মতো তুমি স্পষ্ট ফুটে ওঠো।
আমি মাটি আর তুমি যেন বিকীর্ণ ধুলো,
নদী যেমন গাঢ় করে তোলে পলি, ঢেকে রাখে জটিল শিকড়,
তুমিও তেমনি ছড়িয়ে পড়ো আমার সত্তার গভীরে,
নদীর মতো সঙ্গে করে আনো এক গাঢ় অন্ধকার।
তাই আজ শোণিতে অথবা শস্যে, মৃত্তিকায় অথবা আগুনে
আমরা এক স্তব্ধ মহীরুহের মতো বেঁচে থাকি
যে তার নিজের পাতাগুলোকেও পর্যন্ত চেনে না।

পাথরে প্রতিকৃতি

হ্যাঁ আমি ওঁকে চিনি, বছরের পর বছর আমি কাটিয়েছি ওঁর সঙ্গে
ওঁর স্বর্ণময় আর পাথুরে আকৃতির সঙ্গে,
উনি এমনই একজন মানুষ যিনি অসম্ভব ক্লান্ত—
যিনি প্যারাগুয়েতে হারিয়ে এসেছেন তাঁর বাবা-মা
বউ-ছেলে ভাইপো-ভাগনি
ঘর-বাড়ি ক্ষেত-খামার
আর অর্ধেক-খোলা কিছু বই।
হঠাৎ একদিন পুলিস এসে দরজা ধাক্কালো,
গ্রেফতার করে নিয়ে গেলো ওঁকে,
এমন বেদম মার মারলো যে
ফ্রান্স ডেনমার্ক ইতালি স্পেনেও চলকে পড়লো ওঁর রক্ত,
তারপর থেকে আমি ওঁর মুখটা আর কোনোদিন দেখতে পেলুম না
শুনতে পেলুম না ওঁর গভীর নিস্তব্ধতা।
তারপর একদিন এক ঝড়ের রাতে
পাহাড়ের গায়ে তখন জড়িয়ে রয়েছে
তুষারের একটা মসৃণ আস্তরণ,
হঠাৎ দূরে দেখতে পেলুম

ঘোড়ার পিঠে আমার বন্ধু বসে রয়েছেন—
ও'র মুখটা পাথরে স্পষ্ট ফুটে উঠলো
রুক্ষ আবহাওয়াতেও মুখের রেখাগুলো আশ্চর্য উজ্জ্বল,
নাকের গর্তে বাতাসের মৃদু মর্মর যেন উৎপীড়িতে চাপা আর্তনাদ।
শেষ পর্যন্ত নির্বাসনও একদিন শেষ হলো।
পাথরে পরিণত হয়ে তাঁর দেশের মাটিতে
চিরদিনের জন্যে বেঁচে রইলেন।

উৎসব সংগীত

ইসলা নেগরাতে এখন গ্রীষ্ম, সাদা ফেনা.
আমি দেখি
ঢেউয়ের পর ঢেউ কাজ করে চলেছে, কমে যাচ্ছে তার সাদাটে ভাব,
অন্তহীন পেয়ালা থেকে সমুদ্র যেন উপছে উঠছে,
ভাঙাচোরা শান্ত আকাশ ভরে গেছে
মৌন পাখিদের মন্থর পাখায়,
হলুদের ছোপ লাগে,
পালটে যায় মাসটার রঙ,
বেড়ে ওঠে সমুদ্র-সৈকত সুসংলগ্ন শরতের গাছপালা।
আমাকে সবাই পাবলো বলে ডাকে,
এখনও পর্যন্ত আমি প্রায় একই রকম রয়ে গেছি
সন্দেহ আর ভালোবাসায়,
ঋণের বোঝা আমার কোথাও এতটুকু কমেনি।
নাবিকঅধ্যুষিত আমার সেই বিশাল সমুদ্র
এগিয়ে চলেছে ঢেউয়ে ঢেউয়ে,
আমি এমনই চঞ্চল যে ভ্রমণ করে বেড়িয়েছি সেইসব অঞ্চল
যা এখনও জন্মায়নি—
সমুদ্র আর তার আশপাশের দেশগুলোতে আমি যাই আসি,

মাছেদের ভাষা আমি স্পষ্টই বুঝতে পারি, চিনি তাদের
শক্ত ধারালো দাঁত, অক্ষাংশের হিমশীতলতা,
প্রবালের রক্ত, তিমিদের ভয়ংকর নৈঃশব্দ্যভরা রাত্রি,
কেননা আমি গেছি এক দেশ থেকে আর একটা দেশে,
বিধ্বস্ত নদীমোহনায়, দুর্গম সব অঞ্চল,
এবং বরাবরই আমি ফিরে এসেছি, কোথাও কোনো শান্তি পাইনি—
আর আমার নিজের শেকড় বলতে যখন কিছু নেই
তখন আমি তোমাদের নতুন কি কথা শোনাবো বলো ?

২

শক্ত মাটিতে ফিরে না আসা পর্যন্ত তোমাদের নতুন কি কথা শোনাবো বলো ?
বৃষ্টি ছাড়া আমি কার কাছেই বা ফিরবো ?
তাই যেখানে আমি নিজেকে খুঁজে পেয়েছি
সেখানে আমি কোনোদিনই ছিলুম না
এবং ফিরে আসা ছাড়া আমি কখনও ভ্রমণেও বেরুইনি,
গির্জা থেকে আনা কোনো ছবি বা পবিত্র চুলের গুচ্ছও
কোনোদিন ছিলো না আমার কাছে—
চিরদিনই আমি আমার নিজের পাথরকে
নিজে হাতে রূপ দেবার আপ্রাণ চেষ্টা করেছি
সম্পূর্ণ নিজের খেয়াল-খুশিতে,
প্রচন্ড ক্রোধে, এমনকি আশ্চর্য নিপুণ সমতায়
প্রতিমুহূর্তে আমি স্পর্শ করে গেছি সিংহ-অধ্যুষিত অঞ্চল,
মৌমাছিদের অশান্ত মন্দির,
এমনি ভাবে যখন দেখি যাকিছু দেখার ছিলো
আমার ইতিমধ্যেই দেখা হয়ে গেছে,
স্পর্শ করেছি মাটি আর কাদা, পাথর আর আমার ফেনা,
তখনই প্রকৃতি চিনতে পেরেছে আমার পায়ের চিহ্ন, আমার কণ্ঠস্বর,
আঁকাবাঁকা গাছের শাখা চুম্বনে স্পর্শ করেছে আমার মুখ,
আমি বলি, 'এই যে, আমি এখানে',

আলোয় আমি সম্পূর্ণ নগ্ন হয়ে যাই,
আমার হাতদুটো স্পর্শ করে সমুদ্র,
এবং সবকিছুই যখন আশ্চর্য পবিত্রতায় স্বচ্ছ নির্মল হয়ে ওঠে
তখনই ফিরে আসে আমার শান্তি।

গ্রহ

চাঁদে কি আছে বড় বড় সব জলের পাথর ?
না কি তরল সোনার নির্ঝরিণী ?
শরতের রঙ কেমন সেখানে ?
দিনগুলো কি সেখানে একটার পেছনে আর একটা ছোটে
যতক্ষণ না তারা জট পাকিয়ে যায়
চূর্ণ কুন্তলের মতো ? পৃথিবী থেকে কি
সেই সুদূর গ্রহে ছিটকে পড়ে
কাগজ, মদ, কাটা হাত, মানুষের মৃতদেহ ?

নিমজ্জিত যারা তারা কি সেখানে গিয়ে বেঁচে ওঠে ?

ছেলে ধোয়ানো

একমাত্র সুপ্রাচীন প্রেমই পারে এ পৃথিবীর
শিশুমূর্তিগুলোকে ধোয়াতে পাখলাতে,
হাত-পা আর হাঁটু দলাইমলাই করতে :
টবে জল বাড়ে, পিছলে যায় হাতের সাবান,
আদিম শিশুরা স্নান সেরে উঠে
বাতাসে মায়ের কোল আর ফুলের গন্ধ শোঁকে।

আঃ, মায়ের সে কি সজাগ দৃষ্টি,
মিষ্টি ছলচাতুরী
আর মনভুলোনো ধস্তাধস্তি !

এখন দ্যাখো ছেলেগুলো আবার কেমন চুলে জট পাকিয়েছে,
মুখে গালে কাঠকয়লার আঁকিবুকি,
বুনো আপেল, তেল, আর ঝুল-কালিতে একাকার,
যতক্ষণ না সেই মাতৃস্নেহ
অসীম ধৈর্য ধরে
সাবান আর বালতি
চিরুনি আর তোয়ালে নিয়ে
আবার ওদের ধোয়াতে মোছাতে বসেছে :
আবার সেই ঘষা-মাজা, চুল আঁচড়ানো,
আবার সেই আদিম ছন্দ-ছাপ আর জুঁইয়ের গন্ধ পেরিয়ে
শিশুরা আরও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে বেরিয়ে আসে,
মায়ের হাত ছাড়িয়ে আবার ছিটকে বেরিয়ে যায়
দুরন্ত ঘূর্ণিঝড়ের মাঝে,
যত রাজ্যের তেল, কাদা, নোংরা আর কালিঝুলির দিকে
পাথরের ওপর আছড়ে পড়ে নিজেদের ক্ষতবিক্ষত করবে বলে।
তারপর এমনি ভাবে আবার নতুন করে চলবে
প্রাণছলবলে শিশুদের ধোয়া পাখ্‌লানোর পালা :
পরে বড় হয়ে ওরা ঠিকই শিখে যাবে
পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকার রীতি,
কিন্তু প্রাণচঞ্চল অনাবিল শৈশব
ওরা আর কোনোদিনই ফিরে পাবে না।

শোকের প্রতি

হে শোক, আমাকে দাও
তোমার দুটি কালো ডানা।
এই যে এত রোদ,
পোখরাজের মধুচক্রে ঠাসা এই যে এত মধু,
সারাটা প্রান্তর জুড়ে ঠিকরে ওঠা আলোর কণা,
আলোয় আলো করা চারদিক,
বাতাসে ব্যস্ত ভ্রমরের গুনগুন
আমাকে পাগল করে দিচ্ছে।
তবে তাই হোক
আমাকে দাও তোমার কালো ডানা,
হে সহদোরা শোক,
মাঝে মাঝে আমি চাই
নিভে যাক নীলকান্তমণির দ্যুতি,
তির্যক ধারায় ঝরে পড়ুক অজস্র বৃষ্টিপাত
আর পৃথিবী ডুকরে ডুকরে কেঁদে উঠুক :
মাঝে মাঝে আমি দেখতে চাই
নদীমোহনায় বিধ্বস্ত জাহাজের খোল,
অন্ধকারে ঢাকা বিরাট বাড়ি,
আর আমার মা
প্রদীপ জ্বালাবেন বলে
চিরদিন তেলই খুঁজে গেলেন,
অথচ দীর্ঘশ্বাস ছাড়া
কোনোদিন আলো জ্বালাতে পারেননি।

এখনও রাত্রির জন্ম হলো না।

একটু একটু করে দিন
সরে পড়ছে তার নিজস্ব কবরখানায়

রুটি আর ছায়ার মাঝখানে বসে
মনে পড়ছে
আমার নিজস্ব একটা স্মৃতি,
জানলার সামনে দাঁড়িয়ে খুঁজছি
কি ছিলো না,
কি ঘটতে এখনও বাকি,
চকিতে জলের কালো একটা ডানা
পেরিয়ে এলো সেই হৃদয়
যা দীর্ঘদিন আগেই
আমি হয়তো ভুলে গিয়েছিলাম।

এখন আমি নির্মমভাবে হারিয়েছি
সেই কালো আলোর পিণ্ড।

আমাকে দাও তোমার রক্তের মৃদু স্পন্দন,
হিমেল
বৃষ্টি,
আর তোমার ডানার সেই ভয়ংকর বিস্তার !
আমাকে ফিরিয়ে দাও
বিধ্বস্ত
বন্ধ দরজার
সেই চাবি।
ক্ষণস্থায়ী এ জীবনে
মুহূর্তের জন্যে
ছিনিয়ে নাও আমার সমস্ত আলোক,
সম্পূর্ণ একা
নিজেকে অনুভব করতে দাও,
বুঝতে দাও গোধূলির ঊর্ণজালে কাঁপা
আমার এই যন্ত্রণা
আমার বিচ্ছিন্নতা,

আমার সত্তার সঙ্গে মেশা
বৃষ্টির
প্রকম্পিত
বাহু।

সংক্ষেপে

অজস্র দায়-দায়িত্ব তুলে নিয়েছি আমার কাঁধে
এতে আমি খুশি। আমার জীবনে
জমে উঠেছে অদ্ভুত অদ্ভুত সব দরকারী বেদরকারী জিনিসের স্তূপ
নরম ভূতুড়ে স্পর্শ আমাকে টেনে নিয়ে যায় কোন সর্বনাশের পথে,
কোত্থেকে এক জেদী খনিজ উদ্যম,
এক দুর্বোধ্য বাতাস এসে
আমার জীবনকে উলটে-পালটে দেয়,
মনে পড়ে যায় ছুরি বেঁধার মতো আহত চুম্বনের কথা,
মনে পড়ে যায় আমার ভাইয়েদের অকৃতজ্ঞতার কথা,
আমার চেতনাকে সবসময় সতর্ক রাখতে হয়,
বিপুল আনন্দের আতিশয্যেও
আমার আবেগকে লুকিয়ে রাখতে হয় আমার নিজের মধ্যে,
কেবল আমার নিজেরই মধ্যে।
তাই আমার জীবন
চিরদিনই আনন্দ আর বেদনার মাঝে
এক পাগলা ঝোরার মতো আপন মনে গান গেয়ে বয়ে চলেছে।

পরিপূর্ণ সংহতি

আমার কোনো বাছবিচার নেই, আমি লিখতে পারি
উজ্জ্বল রোদ-ঝলমলে আলোয়, জনাকীর্ণ রাস্তায়,

জোয়ারে ফুলে ওঠা ভরা সমুদ্রে, এমন কি যেকোনো জায়গায়
যেখানে আমি কেবল গান গাইতে পারবো :
শুধু বাউণ্ডুলে রাতগুলোই যা আমাকে জ্বালাতে আসে,
কিন্তু তার অন্ধকারেই আমি পথ খুঁজে নিই,
সংগ্রহ করি সেইসব ছায়া যা দীর্ঘকাল টিঁকে থাকবে।

চারদিক জুড়ে যখন ঘন হয়ে ওঠে রাত্রির কালো ফসল
তারই মধ্যে আমার চোখ মাপজোখ করে নেয় বিশাল প্রান্তর।
সূর্য থেকে সূর্যে আমি সংগ্রহ করে বেড়াই চাবি।
আধো আলো-আঁধারিতে আমি খুঁজে ফিরি বন্ধ তালা
আর ভাঙা দরজাগুলো আমি সমুদ্রমুখোই খুলে রাখি
যতক্ষণ না ফেনা এসে ভিজিয়ে দেয় আমার জামাকাপড়।

চলে যাওয়া, আবার ফিরে আসা আমার কাছে কোনো ব্যাপারই নয়।
মৃত্যু তার পাথরের ফলকে আমাকে কোনোদিনই রুখতে পারেনি।
বেঁচে থাকা কিংবা মরে যাওয়া আমার কাছে কোনো ব্যাপারই নয়।

মাঝে মাঝে সত্যিই ভীষণ অবাক লাগে—
বাবা, মা, না ওইসব উত্তুঙ্গ পাহাড়, উত্তরাধিকারসূত্রে
কোথা থেকে পেয়েছি আমার এই খনিজ কৃতজ্ঞতার দান!

আগুনে ছড়িয়ে পড়েছে সমুদ্র থেকে ওঠা তন্তুরাজি :
এবং আমি জানি আমি চলেছি, চলবো. কেননা আমাকে চলতে হবে,
এবং আমি গান গেয়েছি, গাইবো. কেননা যেহেতু আমাকে গাইতে হবে।

কি ঘটছে না ঘটছে ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে বলার কোনো অবকাশ নেই।
কেননা যখন চোখ বুজিয়ে ভাবি কোন দিকে যাবো
জলের নিচের দুমুখো দুটো স্রোত আমাকে টানতে থাকে—
একটা চায় তার ডালপালা দিয়ে আমাকে মৃত্যুর দিকে ঢেকে রাখতে
অন্যটা চায় গান গাইতে যাতে আমিও গান গাইতে পারি।

তাহলে দেখা যাচ্ছে আমিও 'কেউ না'র দলেরই একজন,
আর সমুদ্র যেমন লবণাক্ত সাদা ফেনার ঢেউয়ে ঢেউয়ে
প্রচণ্ড গর্জনে আছড়ে পড়ে প্রবাল-প্রাচীরের গায়ে
আবার ভাটার টানে টেনে নিয়ে আসে কালো কালো পাথরগুলোকে,
মৃত্যুও ঠিক তেমনি ভাবে আমাকে চারদিক থেকে ঘিরে থাকে
আমার মনের মধ্যে খুলে দেয় বেঁচে থাকার জানলাগুলো
আর বেঁচে থাকার প্রবল আকাঙ্ক্ষার মধ্যেই আমি ঘুমিয়ে পড়ি।
তাই দিনের ঝাঁ ঝাঁ রোদেও আমি ছায়ায় ছায়ায় ঘুরে বেড়াই।

আমার জন্যে অপেক্ষা করো, হে পৃথিবী

আমাকে আমার নির্মম নিয়তির কাছে ফিরিয়ে দাও, হে সূর্য,
আদিম অরণ্যের অঝর বৃষ্টিধারার কাছে.
আমাকে ফিরিয়ে দাও তীব্র সৌরভ
আর আকাশ থেকে ঝরে পড়া সেই তরবারি,
পাহাড় আর সবুজ শ্যামলী চারণভূমির নির্জন প্রশান্তি,
নদীমোহনার স্যাঁতস্যাঁতে ভিজে মাটি,
চিরসবুজ বৃক্ষের মিষ্টি গন্ধ
আর অশান্ত চঞ্চল স্পন্দিত বুকের মতো সজীব বাতাস।

হে পৃথিবী, আমাকে ফিরিয়ে দাও তোমার পবিত্র উপহার,
শেকড়ের গহন গভীর থেকে ওঠা নৈঃশব্দ্যের মিনার।
আমি ফিরে যেতে চাই সেই সত্তায় যা আমি কোনোদিনই ছিলুম না,
এবং সবকিছু থেকে আমি ফিরে যেতে চাই প্রকৃতির আপন কোলে,
বাঁচবো কি বাঁচবো না, সেটা আদৌ কোনো ব্যাপার নয়,
আমি হতে চাই ছোট্ট একটা পাথর,
কুচকুচে কালো একটা পাথর,
পবিত্র নগ্ন একটা পাথর যা নদী বয়ে নিয়ে যাবে দূরদূরান্তে।

নিশান

গাঢ় সমুদ্র-নীল আমার নিশান, তাতে লেজের ওপর ভর দিয়ে খেলা করছে একটা মাছ। যখন শীতের রুক্ষ বাতাস বয় আর রাস্তা-থেকে-দূরে এই নির্জন জায়গাটায় কেউ থাকে না, আকাশ-সাঁতরে-ফেরা ঠিক যেন জীবন্ত মাছ সমেত পাতাকাটাকে বাতাসে চাবুকের তীক্ষ্ম স্বননের মতো পতপত করে উড়তে দেখলে আমার ভীষণ ভালো লাগে।

অনেকে জিগেস করে, এই মাছটা কেন, এর মধ্যে কি কোনো রহস্য আছে? আমি বলি, হ্যাঁ, এ আমার সমুদ্রের প্রতীক, খৃষ্টপূর্বাব্দের জলযাত্রার মকর, উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের কণা।

—আর কিছু?

—না, আর কিছু নয়।

অথচ প্রচন্ড শীতে মাছ সমেত নিশানটা আছড়ে পড়ে বাতাসে, হিমেল হাওয়ায় তিরতির করে কাঁপতে থাকে আকাশের গায়ে।

আর কিছু নয়

আর কিছু নয়
সত্যের সাথে আমার চুক্তি
এ পৃথিবীর জন্যে সঞ্চয় করবো আলো

আমি যা চাই তা হলো রুটি
সংগ্রাম কোনোদিনই অভাব অনুভব করবে না আমার

অথচ এখানে যাকিছু ভালোবাসি সবই পেয়েছি
যা হারিয়েছি তা হলো নির্জনতা।
এখন আমি আর ওই পাথরের ছায়ায় বিশ্রাম নিই না

সমুদ্র কাজ করে চলেছে
নিঃশব্দে কাজ করে চলেছে আমার সত্তায়।